রাসূল যেভাবে রমজান যাপন করেছেন

(বাংলা)

هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

((باللغة البنغالية))

ফায়সাল বিন আলী আল বা'দানী

فيصل بن علي البعداني

অনুবাদ : কাউসার বিন খালেদ

ترجمة: كوثر بن خالد

সম্পাদনা : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নুমান বিন আবুল বাশার

مراجعة: محمد شمس الحق صديق

نعمان بن أبو البشر

2011 - 1432

IslamHouse.com

https://archive.org/details/@salim_molla

পূর্ব কথা

তাকওয়া অর্জন সিয়াম সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মার পরিশুদ্ধি, পার্থিবতায় সর্বাঙ্গ আরোপণ থেকে চেতনা ও মনোজগত বিমুক্তিকরণ, বস্তুকেন্দ্রিকতার রাহুগ্রাস থেকে নিজেকে স্বাধীন করে পরকালমুখীনতার সার্বক্ষণিক চর্চা ও লালন সুগম করে দেয় তাকওয়া অর্জনের পথ-পথান্তর। তবে, তার জন্য শর্ত হল, সিয়াম সাধনার প্রতিটি ক্ষণ যাপিত হতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা-যাপন ও সিয়াম-সাধনার উসওয়া-আদর্শ চেতনায়, অনুভূতিতে, আন্তর ও বহির আচরণে জাগ্রত রেখে, সার্বক্ষণিকভাবে।

রোজা যাপন অবস্থায় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিজের আবেগ-অনুভূতি-আচরণ উন্মীলিত করার আকার-প্রকৃতি, উম্মত বিষয়ে তাঁর পদক্ষেপ ও কর্মচাঞ্চল্যের ধরন-ধারণ, রোজা যাপনকালে পবিত্র স্ত্রীদের বিষয়ে নানাবিধ কর্মযজ্ঞ—ইত্যাদির পথ ধরে সিয়াম-সাধনার যে পূর্ণাঙ্গ নববী রূপ মূর্তিমান হয়েছে তার জন্য প্রাজ্ঞ লেখক ও বিদগ্ধ শরিয়তবিদ ফায়সাল বিন আলী আল বাদানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। প্রখ্যাত গ্রন্থ : হজ পালন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নান্দনিক আচরণ-এর আদলে রচিত গ্রন্থ 'যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান যাপন করেছেন' মাহে রমজান বিষয়ে একটি অভূতপূর্ব রচনা যা রোজা পালন অবস্থায় নববী জীবনের অজানা বহু অধ্যায় উন্মীলিত করেছে মনোজ্ঞ ভাষায়। তারুণ্যদীপ্ত শক্তিমান বঙ্গানুবাদক কাউসার বিন খালেদের ভাষান্তরে বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বিদগ্ধ গবেষক নোমান বিন আবুল বাশার, প্রাজ্ঞ আলেমে দ্বীন আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান অনুবাদকর্ম পরিমার্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পবিত্র মাহে রমজান যাপন ও সিয়াম সাধনায় নববী আদর্শের অনুসরণ-অনুবর্তনের অনুভূতি জাগ্রত করণে বইটি যদি সামান্যতম ভূমিকাও পালন করে তবে আমাদের মেহনত সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের শ্রম কবুল করুন। আমিন।

১৩/৯/২০০৭

মুহাম্মদ শামছুল হক সিদ্দিক

মহা-পরিচালক

আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি

বাড়ী নং -১৪, রোড নং -১৫, সেক্টর - ৪, উত্তরা,

ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমজান-পূর্ব সময় যাপন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমজানে রবের সাথে রাসূলের আচরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমজানে প্রিয় সহধর্মিণীদের সাথে রাসূলের আচরণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রমজানে উম্মতের সাথে রাসূলের আচরণ

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার প্রেরিত নবি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের আদেশ প্রদান করেছেন, আবশ্যক করেছেন তার আনুগত্য। পবিত্র কোরানে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

রাসূল তোমাদের যা প্রদান করেছেন, তা গ্রহণ কর, যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর।[1]

অপর স্থানে বলেছেন—

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করবে, সে আল্লাহরই অনুসরণ করবে, আর যে পিছু হটবে—আমি আপনাকে তাদের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি।[2]

রাসূলের অনুসরণ ও তার আনুগত্য-এতাআতকে আল্লাহ পাক তার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন ও ঘোষণা স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। কোরআনে এসেছে—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

---

[1] সূরা হাশর : আয়াত—৭

[2] সূরা নিসা : আয়াত—৮০

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[1]

রাসূল আমাদের জানিয়েছেন—আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং ফলশ্রুতিতে তার প্রেরিত রাসূলের আদেশ-নিষেধের অনুবর্তন বান্দার যাবতীয় আমল কবুল হওয়া এবং জান্নাত লাভের জন্য শর্ত। হাদিসে এসেছে—

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যা আমাদের দ্বীন সমর্থিত নয়, তা পরিত্যাজ্য।[2]

অপর স্থানে এসেছে—

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا : يا رسول الله و من يأبى ؟

قال : من أطاعني دخل الجنة، و من عصاني فقد أبى.

আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে—অস্বীকারকারী ব্যতীত। সকলে প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল ! অস্বীকারকারী কে ? রাসূল বললেন: যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অবাধ্য হল, সে-ই অস্বীকার করল।[3]

রাসূলের প্রতি এ আত্মিক সমর্পণ, তার সর্বৈব অনুসরণ-অনুবর্তন, নিরঙ্কুশ সম্মতি, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব নয়—জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল অনুষঙ্গে : প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে; বাধামুক্ত হয়ে, বিরোধিতা-প্রতিরোধহীনভাবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন—

---

[1] সূরা আলে ইমরান : আয়াত—৩১

[2] মুসলিম—১৭১৮

[3] বোখারি—৭২৮০

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

আল্লাহর শপথ ! তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিধায়ক (ফায়সালাকারী) হিসেবে মান্য করা, এবং তৎপরবর্তী অবস্থায় তাদের মনে আপনার বিধানের প্রতি খেদ জন্মানো ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাদের ইমান পূর্ণাঙ্গ হবে না।[1]

রাসূলের প্রতি এই আত্মিক সমর্পণ, তার আদেশ-নিষেধের অনুবর্তনের মৌলিক চালক হবে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন, ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসাকে আশ্রয় করে। কারণ, হাদিসে এসেছে, রাসূল বলেছেন—

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده والناس أجمعين.

পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও তাবৎ মানুষের তুলনায় আমি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হওয়া ব্যতীত তোমাদের কারো ইমান পূর্ণাঙ্গ হবে না— হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে রজব মন্তব্য করেন— বিশুদ্ধ প্রেম ও ভালোবাসা প্রিয় বিষয়গুলো পছন্দ করা এবং অপ্রিয় বিষয়গুলোকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করার ক্ষেত্রে অনুসরণ-অনুবর্তন ও অবিকলতার দাবি করে।[2] ইবনে হাজার বলেন—মহব্বত ও ভালোবাসা হিসেবে এ স্থানে উদ্দেশ্য নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভালোবাসা। স্বভাবত ও প্রাকৃত যে ভালোবাসা—তা উদ্দেশ্য নয়, ইমাম খাত্তাবি এ মতই পোষণ করতেন।[3]

সে মহান ও সৌভাগ্য-মণ্ডিত স্তরে উন্নীত হওয়ার একমাত্র পথ ও পাথেয় হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যাবতীয় আনুষঙ্গিকতায় রাসূলের

---

[1] সূরা নিসা : আয়াত—৬৫

[2] ইবনে কাসির : তাফসিরুল কোরআনিল আযিম ; খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২১

[3] ইবনে হাজার : ফতহুল বারি ; খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯

পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি ও বিশুদ্ধ নীতিমালা সম্পর্কে জানা ও পালন করার অভ্যাস গড়ে তোলা। রাসূলের হেদায়েতের সাথে বান্দার ক্রমান্বয় নৈকট্য অর্জন ও তার সুন্নত অনুসারে দ্বীন-আমল সম্পাদন উঁচু ও সম্মানিত স্থান লাভের মজবুত সিঁড়ি, যা বেয়ে মানুষ তার মনুষ্য জীবনের পূর্ণতায় আরোহণ করে। তাই, এ মৌলনীতির ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা রাসূলকে মানুষের জন্য ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন—আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ—যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের কামনা করে, এবং আল্লাহকে অধিক-হারে স্মরণ করে।[1]

ইসলামে রমজান মাস যেহেতু এবাদত ও এবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলার একটি উত্তম ও কার্যকরী সময়, বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ—মানুষ যা রাসূলের অনুসরণ ও ইত্তেবার মাধ্যমে হাসিল করতে পারে, তাই এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য রাসূলের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। রাসূল তার জীবনে যে নয়টি রমজান পালন করেছেন, রমজান পালন ও তাতে এবাদত সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় বান্দাদের সামনে তুলে ধরেছেন ; আমাদের তাই কর্তব্য, এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করা, এবং সে অনুসারে আমলে ব্রতী হওয়া।

রাসূলের রমজান পালন ও তাতে এবাদত পালন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোকে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করতে পারি। যথা :

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমজান-পূর্ব সময় যাপন
- রমজানে রব তাআলার সাথে রাসূলের আচরণ

---

[1] সূরা আহযাব : আয়াত—২১

- রমজানের স্ত্রী ও সহধর্মিণীদের সাথে আচরণ
- রমজানে উম্মতের সাথে আচরণ

বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়টির প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করেছি—বলা যায়, নীতিমালা হিসেবে মান্য করেছি, তা এই যে, পুরো বইয়ে হাদিসের রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখের ক্ষেত্রে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হাদিস ব্যতীত অন্য কোন হাদিস স্থান দেইনি। যুগের সেরা ও সর্ব-মান্য হাদিসবেত্তাদের—যেমন শায়েখ আলবানী, শায়েখ শুয়াইব—কর্তৃক স্বীকৃত ও উল্লেখিত হওয়ার পরই কেবল আমি তাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছি। তবে, এক্ষেত্রে, সচেতনভাবেই বাহুল্য বর্জন করেছি, কলেবর বৃদ্ধি ও টীকা-টিপ্পনিতে জর্জরিত না করে পাঠকের জন্য সহজ-পাঠ্য করাই ছিল আমার লক্ষ্য।

যারা আমাকে এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলার কাছে, সহযোগিতা, সৎপথ ও তওফিক কামনা করি, সার্বিকভাবে, আমার যাবতীয় কর্ম, এবং বিশেষভাবে এই কিতাব কবুলের জন্য তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাই। নিশ্চয় তিনি দানশীল, দয়ার্দ্র, মহানুভব।

و صلي الله على محمد و على آله و صحبه أجمعين.

লেখক—

২০/৬/১৪২৮ হিজরি, রিয়াদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমজান-পূর্ব সময় যাপন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমজান-পূর্ব সময় যাপন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পার্থিব বিষয়ে পরিপূর্ণ যুহুদ অবলম্বনকারী, আল্লাহ ও পরকাল দিবসে যা গচ্ছিত ও সংরক্ষিত সে ব্যাপারে খুবই আকাঙ্ক্ষী। রাসূল, তাই, অসন্ন এবাদতকাল উপলক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং বিভিন্ন সময়ে রহমত-বরকত ও কল্যাণ বর্ষণ এবং অবতরণের উপলক্ষ্য ও অনুষঙ্গগুলোর কারণে ব্যাকুল হতেন। কোরআনে এসেছে—

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

আপনি বলুন, আল্লাহর ফজল ও করুণায় এ হয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা যেন আনন্দিত হয়। তারা যা সঞ্চয় করে, সে তুলনায় তা উত্তম।[1]

আয়াতটি প্রমাণ করে মানুষের পার্থিব অর্জিত ধন-সম্পদ বা সঞ্চিত ব্যবহার্য নয়; আনন্দের উপকরণ হল আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কোরআন, ইসলামের ফরজ বিধি-বিধান, ও আনুষঙ্গিক সম্পূরক সমূহ—যার অন্যতম সিয়াম।[2]

আল্লামা ইমাম সাদি বলেন : ইহকালীন ও পরকালীন বিপুল নেয়ামত-রাজির সাথে পার্থিব জগতের অর্জনের কোন তুলনা নেই ; পার্থিব সঞ্চয়—তা যতই অঢেল ও বিচিত্র হোক না কেন, একদিন অবশ্যই বিবর্ণ আকার ধারণ করবে, বিলুপ্ত হবে অচিরে। আল্লাহ তাআলা তাই, তার প্রদত্ত ফজিলত ও করুণাকে আনন্দের উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন-নির্দেশ দিয়েছেন তাকে স্ফূর্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে।

---

[1] সূরা ইউনুস : আয়াত—৫৮

[2] ইমাম তাবারী : জামেউল বায়ান, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৬৮

কারণ, এর মাধ্যমেই আত্মার স্ফুরণ হয়, উদ্বেলিত হয় অপার এক উদ্যমে, কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয় আল্লাহর দরবারে, সঞ্চারিত হয় তার মাঝে এক অমিত শক্তি, সূচিত হয় জ্ঞান ও ঈমান প্রাপ্তির পরম আকাঙ্ক্ষা। সন্দেহ নেই—বান্দার এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয়। আনন্দ ও চিত্ত-স্ফূর্তির এ মাধ্যম খুবই গ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে, ইহকাল প্রবৃত্তি ও তার আস্বাদ জন্ম দেয় যে আনন্দের, কিংবা যে স্ফূর্তি ডাল-পালা মেলেছে অসিদ্ধ পথের বদান্যতায়, তা ঘৃণিত, বর্জনীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা কারুন গোত্রের প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন—

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

তুমি আনন্দিত হয়ও না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা (অনৈতিক উপায়ে) আনন্দিতদের পছন্দ করেন না।[1]

অনুরূপ আল্লাহ তাআলা একই উক্তি করেছেন এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে, যারা আনন্দিত হয়েছে অগ্রহণযোগ্য অনৈতিক বিষয়ের প্রতি দৃকপাত করে—যা রাসূলদের আনীত বিষয়ের পূর্ণ পরিপন্থী।

কোরআনে এসেছে—

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

রাসূলগণ যখন তাদের নিকট আগমন করলেন স্পষ্ট নিদর্শনা সহকারে, তারা আনন্দ অনুভব করল তাদের নিকট যে ইলম ছিল তা নিয়ে।[2] [3]

আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভ ও কল্যাণ-কর্মের বিভিন্ন উপলক্ষের অনুবর্তন ও তাতে সর্বস্ব নিয়োগ বান্দাকে দ্রুত আল্লাহর নিকটবর্তী

---

[1] সূরা কাসাস : আয়াত—৭৬

[2] সূরা গাফের : আয়াত—৮৩

[3] আল্লামা সাদী : তাইসীরুল কারিমির রহমান, পৃষ্ঠা : ৩৬৭

করতে সহায়তা করে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেজা লাভের মাধ্যমে বান্দা উন্নীত হয় উঁচু মর্যাদায়, এগিয়ে যায় দ্রুত সম্মুখ-পানে। নৈকট্য ও কল্যাণ-কর্মের মৌসুমগুলোর উত্তম অনুবর্তনের ফলে সবকিছুই হয় ফলদায়ক, আত্মায় ও দেহে, আন্তর ও বাহ্য সম্পর্কের যাবতীয় সজাগ অনুভূতি নিয়োগ করে আল্লাহর আনুগত্যে সে নিজেকে বিলীন করে দেয়।

নৈকট্য লাভের বিবিধ মাহেন্দ্রক্ষণ এবং রমজানের সদ্ব্যবহারের উত্তম প্রমাণ হল এ ব্যাপারে রাসূলের সর্বাত্মক প্রস্তুতি, মানসিক ও আত্মিকভাবে রমজানকে স্বাগত জানানোর জন্য ব্যাকুলতা ; যেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে কল্যাণব্রতী হয়, উদ্যমী হয় আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা উত্তরণের, সময়গুলো কাজে লাগে পূর্ণাঙ্গভাবে।

এভাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি উভয় জগতের নেতা, রমজান-পূর্ব সময় যাপন করতেন, সমাধা করতেন প্রস্তুতির নানা পর্ব। নিম্নে তার প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ পেশ করা হল—

অন্যান্য সময়ের তুলনায় শাবান মাসে অধিক-হারে রোজা রাখা

রমজানে দীর্ঘদিন রোজা রাখার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য তিনি শাবান মাসে অধিক-হারে রোজা পালন করতেন।[1] আয়েশা রাঃ

---

[1] শাবান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক রোজা পালনের হিকমত কি ছিল ?—এ ব্যাপারে তত্ত্বানুসন্ধানকারী উলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। উল্লেখিত মতটি তার অন্যতম। ভিন্ন একটি মত হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিনটি রোজা পালন করতেন, এ মাসে তার কাযাগুলো আদায় করতেন। ভিন্ন কারো মত এই যে, তার স্ত্রীগণ রোমজানের কাযা রোজাগুলো এ মাসে পালন করতেন, তাই তিনিও তাদের সাথে রোজা রাখতেন। ইবনে হাজার তার ফাতহ গ্রন্থে (খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫৩) বলেন, এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, উসামা বিন যায়েদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! শাবান মাসে আপনি যে পরিমাণ রোজা পালন করেন, অন্য কোন মাসে এতটা পালন করতে দেখি না ! রাসূল উত্তর করলেন, রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস হওয়ার কারণে মানুষ এ মাসের ব্যপারে উদাসীন থাকে। এ এমন মাস, যে মাসে রবের নিকট আমল তুলে ধরা হয়।

হতে বর্ণিত একটি হাদিস বিষয়টির প্রমাণ বহন করে। হাদিসে এসেছে, আয়েশা রা: বলেন—

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এমনভাবে রোজা পালন করতেন যে আমাদের মনে হত, তিনি রোজা ত্যাগ করবেন না। আর কখনো এত দীর্ঘ সময় রোজা ত্যাগ করতেন যে, আমাদের মনে হত তিনি আর রোজা পালন করবেন না। রমজান মাস ব্যতীত পূর্ণ কোন মাস তাকে আমি রোজা পালন করতে দেখিনি। এবং শাবানের তুলনায় ভিন্ন কোন মাসে এত রোজা পালন করতেও দেখিনি।[1]

অন্য হাদিসে এসেছে—

و لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

শাবানের তুলনায় অন্য কোন মাসে আমি তাকে এত অধিক-হারে রোজা পালন করতে দেখিনি। তিনি শাবানের প্রায় পুরোটাই রোজায় অতিবাহিত করতেন। কিছু অংশ ব্যতীত তিনি পুরো শাবান মাস রোজা রাখতেন।[2]

আমি চাই যে, রোজা পালনরত অবস্থায় আমার আমল তার নিকট পেশ করা হোক। হাদিসটি নাসায়ি বর্ণনা করেছেন (২৩৫৭) হাদিসটি হাসান। উল্লেখিত বিভিন্ন মতামতের মাঝে একটি মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া যায় না।

[1] বোখারি : ১৯৬৯।

[2] মুসলিম : ১১৫৬।

সুতরাং, উক্ত হাদিসের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্ররই কর্তব্য, শাবান মাসে অধিক-হারে রোজা পালন করা। বিদগ্ধ উলামাদের মতামত এই যে—শাবানের রোজা হচ্ছে ফরজ সালাতের আগে ও পরে পালিত সুন্নতে মোয়াক্কাদার অনুরূপ এবং তা রমজান মাসের ভূমিকাতুল্য। অর্থাৎ, তা যেন রমজানের পূর্বে পালিত প্রস্তুতিমূলক এবাদত। এ কারণেই শাবান মাসে রোজা পালন সুন্নত করা হয়েছে। এবং সুন্নত করা হয়েছে শাওয়াল মাসের ছয় রোজা। ফরজ নামাজের পূর্বের ও পরের সুন্নতের অনুরূপ।[1]

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বর্তমান পরিস্থিতির সানুপুঙ্খ বিচারক মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—নববী এই আদর্শ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে সমাজ হতে, গুটি কয় ব্যক্তি ব্যতীত এর উপস্থিতি কোনভাবেই নজরে পড়ে না আমাদের। নববী পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা আরোহণ করতে ব্যাকুল-আগ্রহী উচ্চ সম্মানের স্তরে, রাত্রি-দিন যে ব্যক্তি পরকালিন সাফল্য লাভের ধ্যানে মজ্জমান, নিজেকে এর জন্য গড়ে নিচ্ছে নিপুণভাবে, কোথায় সে মহা পুরুষগণ ! জীবনের সবগুলো বসন্তের অনুরূপ, হারিয়ে যাবে এক সময় বরকতময় কল্যাণ লাভের এ মাস—রমজান মাস। আল্লাহ আমাদেরকে এর পুরো সার গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

নবী সা. কর্তৃক সাহাবিগণকে রমজান আগমনের সুসংবাদ প্রদান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিগণকে রমজানের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত-উদ্দীপিত করতেন, পরামর্শ প্রদান করতেন সর্বস্ব নিয়োগ করে তাতে কল্যাণ আহরণের জন্য আত্মনিয়োগের। এ বিষয়ে নানা হাদিস রয়েছে—যেমন :

---

[1] মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২২, ২৩।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء و غلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.

যখন রমজান মাস আগত হয়, আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের কপাটগুলো, এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয় শৃঙ্খলে।[1]

অপর হাদিসে এসেছে—

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر!، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.

রমজানের প্রথম রাত্রিতে শয়তান ও দুষ্ট জিনদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের কপাটগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়—তার একটি দরজাও খোলা হয় না। উন্মুক্ত করে দেয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো, বন্ধ করা হয় না তার একটিও। একজন আহ্বানকারী আহ্বান জানিয়ে বলেন : হে কল্যাণের প্রত্যাশী ! অগ্রসর হও। আর যে অকল্যাণের প্রত্যাশী, বিরত হও। আল্লাহ জাহান্নাম হতে অনেককে মুক্তি দিবেন, এবং তা প্রতি রাতেই।'[2] ভিন্ন এক হাদিসে এসেছে—

أتاكم رمضان؛ شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغَلُّ فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.

[1] বোখারি : ১৮৯৯।

[2] তিরমিজি : ৬৮৩, হাদিসটি সহি।

রমজান—বরকতময় মাস—তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোজা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)।[1]

হাদিসে এসেছে—

إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد

জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে রইয়ান নামে। কেয়ামত দিবসে রোজাদারগণ উক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট হবেন ; তারা ব্যতীত কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না। বলা হবে : রোজাদারগণ কোথায় ? তখন তারা দণ্ডায়মান হবেন, তারা ব্যতীত এ দরজা দিয়ে অপর কেউ প্রবেশ করবে না। তারা প্রবিষ্ট হওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অপর কেউ তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না [2]

সত্য পথের আহ্বানকারী যারা, যারা সর্বক্ষণে, সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ ও ফজিলত পিয়াসি, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল : এ মহান সুন্নত চৌদিকে ছড়িয়ে দেয়া, মানুষের মাঝে এর কল্যাণ বিস্তারে আত্মনিয়োগ করা। তাদের দায়িত্ব হল, মানুষকে তারা রমজানের সুসংবাদ প্রদান করবে, তার ফজিলত ও বরকত সম্পর্কে অবগত করাবে, সময়ের সর্বোত্তম ও উপযোগী ব্যবহার, ও উপকার হাসিলের মাধ্যমে লাভবান

---

[1] নাসায়ি : ২১০৬।

[2] বোখারি : ১৭৯৭।

হওয়ার পথ বাতলে দেবে। সুসংবাদ ও সৌভাগ্যের বাণী-মাধুর্যে বিধৌত করবে মানুষের মন-মানস। রমজান যাপনের মাধ্যমে উদ্বেল হবে একে-অপরে, আবদ্ধ হবে সম্প্রীতির বন্ধনে। যে কোন বিষয়ের তুলনায় এর জন্য অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কি উপায়ে সর্বাত্মক কল্যাণ আহরণ হয়, এবং ভরিয়ে তোলা যায় আত্মাকে—অনুসন্ধান করবে এ বিষয়ে। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও উত্তম পানাহারকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসবে না যে, মনে হয়, এগুলোই রমজানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ, এর মাধ্যমে রমজানের উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়, বাধা প্রাপ্ত হয় কল্যাণ-ধারা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই রমজান অতিবাহিত হয় তার অগোচর-সন্তর্পণে। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন, প্রদান করুন সঠিক পথের দিশা।

রমজানের বিধান বর্ণনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে সাহাবিদের নানা বিধান সম্পর্কে অবগত করাতেন, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ঋজু পথ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করতেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উল্লেখিত অনেক হাদিস ও হাদিসাংশ এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ।

বর্তমান সময়ে, রাসূলের উক্ত কর্মপন্থা অনুসারে, আমাদের দায়িত্ব হল : যারা উম্মতের মহান আলেম ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত দায়ি, তারা সাধারণ মানুষকে রমজানের যাবতীয় হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত করাবেন, রমজান-পূর্ব ও মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের মাঝে ব্যাপক দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। প্রত্যেকে সাধ্য ও সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করবেন, যে উপায়ে বিষয়টির বাস্তবায়ন সম্ভব, অবলম্বন করবেন সে সকল উপায়। কারণ, মানুষের মাঝে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়েছে, দ্বীনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকট অভাব গোচরীভূত হচ্ছে সাধারণ মুসলমান—কখনো কখনো বিশেষ শ্রেণির মাঝেও—সমাজে।

সাধারণ মুসলমান—নারী হোক কিংবা পুরুষ—নির্বিশেষে, সকলের কর্তব্য : পবিত্র রমজানে পালিত যাবতীয় এবাদত ও জিকির-আজকার বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা। সুতরাং, তারা রমজান বিষয়ক বই-পত্র অধ্যয়ন করবে, অডিও প্রোগ্রাম শ্রবণ করে স্বচ্ছ ধারণা লাভে প্রয়াস চালাবে। হাজির হবে ইলম ও জ্ঞানের মজলিস সমূহে।

কারণ, যে কোন বিষয়ের মৌলিক খুঁটি হচ্ছে সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা, এবং পরবর্তীতে সে অনুসারে আমল করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়—এমন আমল পরিত্যাজ্য সর্বার্থে। গ্রহণযোগ্য কেবল সে আমলই, যার ভিত্তি অতি মজবুত, যার আচরিত কর্মপন্থা সঠিক ও নির্ভুল।

ইলম, আমল, ও দাওয়াতি ক্ষেত্রে যে রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, গ্রহণযোগ্য কেবল তার আমলই।

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য কিংবা শাবান পূর্ণ হওয়া ব্যতীত রোজা আরম্ভ না করা

রমজান মাসের চাঁদ দেখেছে, এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য, কিংবা পূর্ণ শাবান মাস অতিবাহিত হওয়া ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান পালনের সূচনা করতেন না। চাঁদ দেখা ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ নিদর্শন ও সময় অতিবাহনের প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত ; যে কোন সময় ও স্থান হতেই যা চিহ্নিত করা সম্ভব। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ যে কোন বিষয়কে স্বীকৃতি প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করে না, প্রকাশ্য মাধ্যমকে কবুল করে নেয় অতি সহজে, তাই ইসলাম একে প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

চাঁদ দেখা, অত:পর, সাক্ষ্য প্রদান বিষয়ক বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :—

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تراءى الناس الهلال؛ فأخبرت رسول الله صلي الله عليه و سلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, মানুষ সম্মিলিতভাবে চাঁদ দেখল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ প্রদান করলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূল, তাই, রোজা রাখলেন, এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন রোজা পালনের।[1]

ইবনে আব্বাস হতেও এ জাতীয় এক হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনি বলেন :—

جاء أعرابي إلى النبي صلي الله عليه و سلم فقال: إني رأيت الهلال -يعني رمضان-، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟. قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟، قال: نعم. قال: يا بلال أذِّن في الناس فليصوموا غداً

এক গ্রাম্য সজ্জন রাসূলের দরবারে আগমন করে আরজ করল : আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি। রাসূল বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ? লোকটি উত্তর দিল : হ্যা। রাসূল বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ? উত্তর দিল : হ্যা। রাসূল অত:পর বেলাল রা.-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে বেলাল ! মানুষকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী কাল রোজা রাখে।[2]

হাদিসটি ইসলাম ধর্মের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে ; বিশেষত: যারা সাধারণ মানুষের সাথে কাজ করেন এমন দায়ি ও সংস্কারকদের জন্য বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে : ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে, কিংবা ইঙ্গিত করে জ্ঞানগত দৌর্বল্যের প্রতি, ব্যক্তি স্বার্থের দ্বারা কলুষিত করে—এমন অবস্থা ব্যতীত সাধারণ

[1] আবু দাউদ : ২৩৪২। হাদিসটি সহি।

[2] আবু দাউদ : ২৩৪০।

মানুষের প্রতি আস্থা রাখা, তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা বিধি সম্মত। কারণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে—যাকে রুকনের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে—সাধারণ এক গ্রাম্য ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

রমজান মাসের চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হলে শাবান মাস পূর্ণ করা সংক্রান্ত হাদিস নিম্নরূপ : চাঁদ দেখার প্রতি নির্ভর করা এবং মাস গণনার ক্ষেত্রে হিসাবের প্রতি গুরুত্ব প্রদান না করার নির্দেশ করে রাসূল বলেন—

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها؛ فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا

তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, চাঁদ দেখেই ভঙ্গ কর। চাঁদ দেখাকে অভ্যাসে পরিণত কর। যদি চাঁদ না দেখা যায়, তবে ত্রিশ দিন পূরণ কর। যদি দু’ ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তোমরা রোজা রাখ, এবং রোজা ভঙ্গ কর।[1]

অপর হাদিসে এসেছে—

الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

মাস হল ২৯ রাত্রি। তবে, চাঁদ না দেখে তোমরা রোজা রেখ না। যদি চাঁদ না দেখা যায়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।[2]

শরিয়ত বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর এ সংক্রান্ত অতি সাবধানতার পদ্ধতি অবলম্বন নি:প্রয়োজন। তাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহের দিনে রোজা পালন করে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে নিষেধ করে এরশাদ করেছেন—

---

[1] নাসায়ি : ২১১৬, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ১৮০৮।

لا تصوموا قبل رمضان؛ صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين

তোমরা রমজান আগমনের পূর্বে রোজা পালন কর না, চাঁদ দেখে রোজা রাখ, এবং ভঙ্গ কর। যদি মেঘে ঢেকে যায়, তবে ত্রিশ পূর্ণ কর।[1] অপর স্থানে এসেছে—

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.

রমজান-পূর্ব শেষ দিবসগুলোতে তোমরা একদিন, কিংবা দু দিন রোজা রেখ না, তবে এমন ব্যক্তির জন্য তা বৈধ, যে পূর্ব হতেই কোন রোজা রাখছিল।[2]

সন্দেহের দিন রোজা রাখা—যেমন অতিরিক্ত সতর্কতা বশত: কেউ কেউ করে থাকে—নিষিদ্ধ।[3] কারণ, হাদিসে স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখা কিংবা শাবান মাস পূর্ণ করার উপর বিষয়টিকে নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। আম্মার ইবনে য়াসার, তাই, বলতেন : মানুষের কাছে সংশয়পূর্ণ দিবসে যে ব্যক্তি রোজা পালন করবে, সে নিশ্চয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতায় লিপ্ত হল।[4]

---

[1] নাসায়ি : ২১৩০, হাদিসটি সহি।

[2] মুসলিম : ২০৮২।

[3] সন্দেহের দিন রোজা রাখার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, তা নিষিদ্ধ। তবে যারা নিষিদ্ধ বলেছেন—নিষেধটি কি হারাম ও মাকরূহ ?—এ নিয়ে তাদের মাঝে বিরোধ রয়েছে। কোন কোন হাম্বলী ইমাম এ দিন রোজা রাখা ওয়াজিব বলেছেন। অপর কেউ বলেন, সতর্কতামূলক এ দিন রোজা পালন করা জায়েজ। ইমাম আবু হানিফা এ মত অবলম্বন করেছেন। ইমাম আহমদ থেকেও এই মত পাওয়া যায়। সাহাবি ও তাবেইনের বৃহৎ একটি দল, কিংবা তাদের অধিকাংশের মত এরূপই। ইবনে তাইমিয়া একই মত পোষণ করেছেন। দ্র : মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২৫, পৃষ্ঠা : ৯৮-১০০।

[4] তিরমিজি : ৬৮৬, হাদিসটি সহি।

কিন্তু যে ব্যক্তি চাঁদ দেখতে সক্ষম হয়নি ; কিংবা যে অনুসন্ধান করেছে—সম্ভব হয়নি তার জন্য অপেক্ষা করা, এবং রোজা পালন করেছে এক ধরনের দোদুল্যমান নিয়ত নিয়ে—যেমন, যদি দিনটি রমজান ভুক্ত হিসেবে প্রমাণ হয়, তবে আমি রমজানেরই রোজা হিসেবে তা পালন করলাম, অন্যথায় নয় ; তবে তা তার জন্য—অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতানুসারে—যথেষ্ট হবে। কারণ, নিয়ত ইলম বা জানার অনুবর্তী। যদি সে জেনে থাকে যে, আগামী কাল রোজা, তবে তাকে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে। যদি সে নিয়ত করে নফল রোজা রাখার, কিংবা নিয়তকে মুক্ত রাখে, তবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে না। কারণ, আল্লাহ তাকে ওয়াজিব আদায়ের ইচ্ছা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াজিব হচ্ছে রমজান মাস, যার ওজুব সম্পর্কে সে জ্ঞাত হয়েছে। যদি সে ওয়াজিব পালন না করে, তবে দায় থেকে মুক্ত হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি আগামী বেলার রোজা হওয়ার ব্যাপারে সে জ্ঞাত না হয়, তবে তার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ত আবশ্যক নয়। না জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিয়তকে নির্দিষ্ট করার ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মত দেয়, প্রকারান্তরে সে দুটি বিপরীত বিষয়কে একীভূত করে নিয়েছে।[1] আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

মাসের সূচনা ও সমাপ্তি নির্ধারণের বিষয়টিকে যদি সকলে চাঁদ দেখা কিংবা ত্রিশ পূর্ণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট করে নেয়—হাদিসের স্পষ্ট হেদায়েত আমাদের যে নির্দেশ প্রদান করেছে, তবে পঞ্জিকা অনুসারে সৌর বাৎসরিক হিসাব গণনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নতুন ফেরকা ও তার ফেতনার ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে হবে না। শরিয়ত, সন্দেহাতীতভাবে, তার ভিত হল : সাব্যস্ত ও প্রশ্নাতীত শরয়ি বর্ণনার অনুসরণ, ও তা মান্য করা। শরয়ি নস বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করেছে চাঁদ দেখার সাথে, পঞ্জিকার সাথে নয়। যখন চাঁদ দেখা যাবে, যদিও তা

---

[1] মাজমুউল ফাতাওয়া—ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড : ২৫, পৃষ্ঠ : ১০১।

দৃষ্ট হয় নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র হতে, তবে, সে অনুসারে আমল করা আবশ্যক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, বিষয়টি তখন রাসূলের ব্যাপক উক্তি—'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, কিংবা ভঙ্গ কর'-র আওতাভুক্ত হবে। যদি না দেখা যায়, তবে ত্রিশ পূর্ণ করা ওয়াজিব।

চাঁদ দেখার জন্য দূর্বীণ ব্যবহার নিষিদ্ধ নয় ; তবে, ব্যবহার আবশ্যকও নয়। কারণ, হাদিসের বাহ্য বর্ণনা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, স্বাভাবিক দৃষ্টির উপর ভরসা করাই যথেষ্ট।[1] সম্মিলিতভাবে, চাঁদ দেখা উচিৎ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি—

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

যেদিন তোমরা সকলে রোজা পালন করবে, সেদিন রোজা ; যেদিন সকলে ঈদুল ফিতর পালন করবে, সেদিন ঈদুল ফিতর। আর যেদিন সকলে কোরবানি পালন করবে, সেদিন ঈদুল আযহা।[2]

হাদিসটির ব্যাখ্যা এই যে, রোজা রাখা, ভঙ্গ করা, ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে সকলের অনুবর্তী হওয়া এবং অধিকাংশ মানুষের মতামত গ্রহণ করাই কাম্য। এ সকল বিষয়—প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুসারে—ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হবে না। জামাত-চ্যুত হওয়াও, এ ক্ষেত্রে, বৈধ নয়। বিষয়গুলো, বরং, ইমাম ও সকল মানুষের মতের অনুবর্তী করা হবে। ব্যক্তি বিশেষ ভিন্ন মতের অধিকারী হলেও, সকলের অনুবর্তী হওয়াই তার জন্য ওয়াজিব।[3]

---

[1] ইবনে উসাইমিন : মাজমূউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭।

[2] তিরমিজি : ৬৯৭, হাদিসটি সহি।

[3] কোন ব্যক্তি একাকী রোজার বা ঈদের চাঁদ দেখল, এবং মানুষ তার কথা গ্রহণ করল না—তার ক্ষেত্রে কীভাবে সমাধান প্রদান করা হবে, এ ব্যাপারে আলেমগণ তিন মতে বিভক্ত হয়েছেন। একদলের মত এই যে, সে রোজা রাখবে, এবং যেহেতু সে নিচে চাঁদ প্রত্যক্ষ করেছে, তাই গোপনে রোজা ভঙ্গ করবে এবং আহার করবে। অপরদলের মত : রোজা পালন করবে এবং সকলের সাথে সম্মিলিতভাবে পরাদিন ঈদ পালন করবে। তৃতীয়

দায়িগণ যদি এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন, নববী হেদায়েতের এ নীতিমালাকে নির্ধারণ করে নেন নিজেদের পালনীয় একমাত্রিক বিধান হিসেবে, তবে নানামুখী বিভক্ত দলগুলোর মাঝে সমতা বিধান করার কার্যকরী প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম হবেন, সফল হবেন পারস্পরিক দূরত্ব ও বিরোধ নিরসনে। এর জন্য যে কার্যকরী নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে, তাহল : গ্রহণযোগ্য কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, চাঁদ দেখার দায়িত্ব যার নেতৃত্বে পালিত হবে। তার নেতৃত্বে শরিয়ত সিদ্ধ পদ্ধতিতে যখন চাঁদ দেখা যাবে, সকলে রোজা রাখবে, কিংবা ঈদ পালন করবে। যদি শরিয়ত সিদ্ধ পদ্ধতিতে চাঁদ দেখা না যায়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।[1] যে ভূমিতে অবস্থান করছে, সেখান থেকে যদি

মত হল : সে রোজা রাখবে সম্মিলিতভাবে সকলের সাথে, এবং ভাঙবেও তাদের অনুসারে। এটিও, উপরোক্ত হাদিসের আলোকে, উত্তম ও গ্রহণযোগ্য মত। ইবনে তাইমিয়ার মাজমুউ ফাতাওয়া দৃষ্টব্য। খণ্ড : ২৫, পৃষ্ঠা : ২১৪-২১৮।

[1] নানা মতের মাঝে অধিক গ্রহণযোগ্য বক্তব্য অনুসারে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। ভূমিগত পার্থক্যের কারণে চাঁদ কখনো এক স্থানে দেখা দেয়, অপর স্থানে দেখা দেয় না। যদিও অন্যান্য ভূমির সাথে পার্থক্য হয়, তবু নির্দিষ্ট ভূমির অধিবাসীরা তাদের দেখার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোন ভূমিতে এক ব্যক্তি যদি চাঁদ দেখে, তবে সকলের উপর রোজা রাখা বা ঈদ পালন ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে কোরআনের বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোরআনে এসেছে— شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }[البقرة: ١٨٥]، অর্থাৎ, রমজান মাস, যাতে কোরান নাজিল হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়েত ও সত-অসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। তোমাদের মাঝে যে মাস প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন রোজা রাখে। রাসূল বলেছেন—তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, এবং ভঙ্গ কর। শারের পক্ষ হতে মাসে উপস্থিত হওয়া, এবং চাঁদ দেখার সাথে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে, চাঁদ উদিত হওয়ার স্থান ভূমিগত পার্থক্যের ফলে পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে এখানে ভিন্ন একটি মত রয়েছে, গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে যা খুবই শক্তিশালী। যদি কোথাও, একটি মাত্র স্থানে, শরিয়ত সিদ্ধ উপায়ে চাঁদ দেখা যায়, তবে সকল মুসলমানের উপর সে অনুসারে আমল আবশ্যক হবে। এর প্রমাণ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি 'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, এবং ভঙ্গ কর।' উক্ত হাদিসে সম্বোধন ব্যাপক রাখা হয়েছে, সুতরাং, সকলের জন্য এর অনুবর্তন জরুরী। দ্র : মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৭।

চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়, তবে অধিক নিকটবর্তী মুসলিম দেশের অনুসারে আমল করবে—সুতরাং, তাদের সময় অনুসারে রোজা পালন করবে। কারণ, এটিই তাদের জন্য সহজতর। আল্লাহ বান্দার উপর অসাধ্য কিছু চাপিয়ে দেন না।

মনে কর, মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংস্থা কিংবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করল, মাস সূচনা-সমাপ্তির ক্ষেত্রে যা খুবই দুর্বল— যেমন সৌরবাৎসরিক পঞ্জিকা মতে রোজা রাখা বা ভঙ্গ করার আদেশ জারি করল, তবে এ ক্ষেত্রে বাহ্যত: তাদের অনুসরণ করাই শ্রেয়। যারা নেতৃত্ব প্রদান করছে, কিংবা সাধারণ মুসলমান জনসাধারণ ব্যাপকভাবে যে মতের অনুসরণ করছে, তা মেনে নেয়াই কাম্য। কারণ, প্রকাশ্য আচরণীয় মতবিরোধ এড়িয়ে যাওয়া খুবই জরুরি। হাদিসে এসেছে—الصوم يوم تصومون —অর্থাৎ, যেদিন সকলে রোজা পালন করবে, সেদিনই রোজা। এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া, শরিয়ত ও মানবিক যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামের এ জাতীয় অমৌলিক মাসআলার ব্যাপারে বিরোধ এড়িয়ে ঐক্যের ভিত দৃঢ় করার মাঝে কল্যাণ নিহিত।

মাসের সূচনা ও সমাপ্তির ব্যাপারে সংখ্যালঘু কিছু মুসলিম সমাজের মাঝে এ জাতীয় বিরোধ এমন একটি বিষয়, যা কোনভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ, বিষয়টি কিছুটা জটিল, অমীমাংসিত ; কোথাও কোথাও অমুসলিম দেশে মুসলমানগণ মত প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে নানাভাবে দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে সুষ্ঠু সুরাহা বাধা প্রাপ্ত হয় চূড়ান্তরূপে। সুতরাং, ঐক্য-মত্যের প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। যা তোমার কাছে মনে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ও পালনীয়, ফেতনা ও মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য দূর করার জন্য কখনো যদি তা ত্যাগ করতে হয়, তুমি নির্দ্বিধায় তা কর।

তবে, মুসলিমদের কোন উপদল যদি এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে, তাহলে দুটি উপায়ে সমাধান প্রদান করা যেতে পারে :—

প্রথমত: বিষয়টি ইজতিহাদ প্রসূত এবং নতুন বৈধ যে কোন সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যত্যয় আরোপের অনুকূল—সকলকে এ ব্যাপারে অবগত করানো, এবং জানানো যে, মাসআলাটি খুবই মতবিরোধপূর্ণ, নানাভাবে তাতে মতবিরোধ আরোপ করা যায়। মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে—এর সূত্রে ধরে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা সৃষ্টি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিনষ্টের কোন মানে হয় না। শরিয়তের অনুসরণ ও অনুবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উম্মতের ঐক্য ; সুতরাং সুন্নত আঁকড়ে ধরার নিমিত্তে পারস্পরিক বিভেদ তৈরির কি অর্থ থাকতে পারে ?!

দ্বিতীয়ত: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা সংখ্যালঘু, নিজেদের মতামত তারা গোপন করবে, এড়িয়ে যাবে সকলকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা সংখ্যাগুরু, আক্ষরিক অর্থে যাদের হাতে নেতৃত্ব, অনর্থক নিজেদের সিদ্ধান্ত পেশ করে তাদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হবে না।

দু:খজনক হল, আমরা প্রায়শ: লক্ষ্য করি, অধিকাংশ বিরোধ উদ্ভূত দলীয় মতবিরোধ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের কারণে, যারা নির্দিষ্ট একটি এলাকার পক্ষ-বলয়ের হওয়ার ফলে সে এলাকার অনুবর্তী হয়, তৎপর হয় নিজেদের মতকে সকলের তুলনায় শ্রেয়তর হিসেবে প্রমাণ ও বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এবং জড়িয়ে পড়ে ভ্রাতৃঘাতী বিরোধে। এভাবে, অনৈতিক উপায়ে তারা নিজেদের মতকে কোন প্রকার প্রামাণ্য ভিত্তির পরোয়া না করে পরিয়ে দেয় শরিয়তের টুপি, উঁচিয়ে ধরে সকলের মাথার উপর ! আল্লাহর কাছে আমাদের সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের দ্বীনের মর্ম উপলব্ধির তওফিক দান করেন, তওফিক দান করেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের। মুসলমানদের ঐক্য-সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের জন্য নিরলস কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন।

আল্লাহর কাছে যা গচ্ছিত ও রক্ষিত আর পরকাল দিবসে অপেক্ষা করছে যে মহান নেয়ামত—তার প্রত্যাশী হে মোমিন ! ভেবে দেখ একবার নিজের অবস্থা, বিবেচনা কর তোমার করণীয়। রমজানের মহান সুযোগ, সন্দেহ নেই, উম্মতের জন্য গনিমত স্বরূপ, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা মানুষের এবাদতের সচেতন অনুভূতিকে জাগরূক রাখে ; বল দান করে স্মৃতিকে, উদ্যমী করে তার একান্ত পৃথিবী। এবাদতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে সাহস জোগায়। অপরদিকে, ইতিবাচক এ বিষয়গুলোর পাশাপাশি, নেতিবাচক নানা অপ-চিন্তা, কর্ম ও পাপ হতে মুক্ত রাখে চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাকে। চিত্তবৃত্তি, প্রবৃত্তিপুজা, অনর্থক চাঞ্চল্য—মুক্ত রাখে ইত্যাদি হতে। তাই, রমজান মাসে, আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের এবাদতগাহগুলো লোকে লোকারণ্য—আত্মায়, মননে, কর্মে ও সফেদ চিত্তবৃত্তিতে যারা পরিপূর্ণ মোমিন, পরিশুদ্ধ জাকের, আত্মশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা অতিক্রমকারী আল্লাহ-প্রেমিক। সুতরাং, হে মুসলিম ভাই ! রমজানকে পূর্ণ প্রস্তুতি সহ স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নাও, সুবর্ণ সময়গুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য নিজেকে গড়ে তুল। সময়গুলো কাজে লাগাবার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে—এ সময় আত্মিক, মানসিক ও দেহগত যাবতীয় পাপ হতে কায়মনোবাক্যে তওবা করা, পবিত্র করা নিজেকে গোনাহের তাবৎ অনুষঙ্গ হতে। এবাদত হুকুম-আহকাম বিষয়ে গভীর উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হওয়া। নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও সূচী তৈরি করে সে অনুসারে সময় ও কর্ম বিন্যাস করে সর্বাত্মক ফায়দা হাসিলে উদ্যোগী হওয়া।

হে আল্লাহ, আমাদের কল্যাণ ব্রতী হওয়ার তওফিক দান করুন, আপনার আনুগত্যে উৎসাহী ও আপনার ক্রোধের উদ্রেককারী যাবতীয় বিষয় পরিহারে আমাদের সহায়তা করুন। আমিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমজানে রবের সাথে রাসূলের আচরণ

রমজানে রবের সাথে রাসূল সা.-এর আচরণ

হেদায়েতের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাবৎ সৃষ্টিকুলের মাঝে রব তাআলা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, তার হকের প্রতি সর্বাধিক লক্ষ্য প্রদানকারী। আল্লাহ তাআলার উবুদিয়াত ও দাসত্ব, যাবতীয় ক্ষেত্রে তার প্রতি নতজানু হওয়া, মানবিক পূর্ণতার রূপায়ণে ক্রমান্বয় স্তর অতিক্রম—ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি স্তর-ক্রম পেরিয়ে এক সময় উপনীত হয়েছেন পূর্ণতর মনজিলে, উচ্চতর অধিষ্ঠানে। সম্মান ও মর্যাদার এমন এক উচ্চতা ছুঁয়েছেন, সৃষ্টিকুলের কেউ যেখানে পৌঁছোতে সক্ষম হয়নি। তার পূর্বাপর যাবতীয় পাপ ও গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

উচ্চতার এমন স্তরে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও, রাসূল দীর্ঘ সময় এবাদতে রাত্রি যাপন করতেন, এমনকি, তার পবিত্র পদ-যুগল স্ফীত হয়ে যেত, ফেটে যেত অসহ্য ব্যথায়। আবু বকর তনয়া আয়েশা সিদ্দীকা অবাক হয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন:—

أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟!

আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না ?[1]

রাসূল কাঁদতেন ভীত-নতজানু হয়ে, আল্লাহকে ডাকতেন বিপদগ্রস্তের অবিকল। সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন শাখীর মন্তব্য করেন :—

رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه و سلم.

কান্নার ফলে বুকে চাকার মৃদু ধ্বনি নিয়ে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত আদায় করতে দেখেছি।[1]

---

[1] বোখারি : ৪৮৩৭।

আয়েশা রা., উম্মুল মোমিনীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা সহধর্মিণী, এক আশ্চর্য বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে বলেন :—

لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرَّك، قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بلَّ حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة؛ فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لِمَ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً، لقد نزلت عليّ الليلة آية، ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات و الأرض... الآية كلها

এক রাতে রাসূল আমাকে বললেন : আয়েশা ! এখন আমি রবের এবাদতে মগ্ন হব। আয়েশা বললেন : আল্লাহর শপথ ! আমি নিশ্চয় আপনার নৈকট্য-সান্নিধ্য পছন্দ করি। কিন্তু, সাথে-সাথে পছন্দ করি এমন বিষয়, যা আপনাকে আনন্দ প্রদান করে। আয়েশা বলেন : অত:পর রাসূল উঠে গিয়ে পবিত্র হলেন এবং সালাতে দণ্ডায়মান হলেন। আয়েশা বলেন : অত:পর তিনি এত ক্রন্দন করলেন যে, তার বক্ষ ভিজে গেল। অথবা—তিনি এতটা ক্রন্দন করলেন যে, তার দাঁড়ি সিক্ত হল। কিংবা—তিনি এতটা ক্রন্দন করলেন যে, তার সম্মুখস্থ জমি ভিজে গেল। অত:পর সময় ঘনালে বেলাল রা. সালাতের আজান দিতে আগমন করলেন, তাকে ক্রন্দনরত দেখে বেলাল বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ! কাঁদছেন কেন, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন ? উত্তরে তিনি এরশাদ করেন : আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না ? আজ রাতে আমার নিকট একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। পাঠ করেও যে ব্যক্তি এ আয়াতে মনোনিবেশ করবে না, তার

---

[1] আবু দাউদ : ৯০৪। হাদিসটি সহি।

ভাগ্যে ধ্বংস আছে—'নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও ভূমি মাঝে...এ আয়াত পুরোটি।'[1]

ভেবে দেখুন ! এ এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, যিনি ছিলেন আদম সন্তানদের নেতা। আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতেই তিনি অবগত ছিলেন যে, জান্নাতের অতি উঁচু স্তরে হবে তার অবস্থান। এ সত্ত্বেও, তিনি এবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নিজেকে এমন উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না বিন্দুমাত্র। লীন করে দিতেন আল্লাহর দরবারে ; আল্লাহ-ভীতি, ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতেন—আত্মা, মনন ও চেতনায়।

পক্ষান্তরে, নববী এ আদর্শের আলোকে আমরা যখন নিজেদের বিবেচনা করি, বিশ্লেষণ করি প্রতিটি কর্ম ও আচরণ, গ্রাস করে সীমাহীন আতঙ্ক—এবাদত ও আনুগত্যের ব্যাপারে কেউ হয়তো অলস ও উদ্যমহীন, হামেশা পাপে নিমজ্জিত কেউ, আল্লাহ প্রেমের ঘাটতি সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় ; তুমি বরং দেখতে পাবে যে, অলসতা ও বিবেক-শূন্যতা যেন জগদ্দল পাথরের মত তাদের চেতনায় জমে বসেছে। দেখতে পাবে, এত কিছুর পরও, নিজেকে ভাবছে সে আল্লাহর যাবতীয় পাকড়াও হতে মুক্ত, বিপদ হতে শত-হস্ত দূর ! যেন কোন ভয়হীন একাধিপত্য ভোগ করছে সে। নববী আদর্শের উক্ত দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আমরা উভয়ের মাঝের যোজন যোজন পার্থক্য সহজে অনুভব করতে পারি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন তিনি, টেনে তুলুন এ বিপদ হতে।

রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আচরণ ও কর্ম নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতেন, তা সকলের জন্য জীবন্ত এক উদাহরণ ; তিনি তার এবাদত ও বিনয়-লীন আনুগত্য আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করতেন। নানাভাবে শোভিত-মহিমান্বিত করতেন তার এ সময়গুলোকে।

---

[1] ইবনে হিব্বান : ৬২০। সনদটি বর্ণিত মুসলিমের শর্ত অনুসারে।

রাসূল যেভাবে রোজা পালন করতেন

এবাদতের বিবিধ উপকরণ দ্বারা রাসূল সা. রোজার দিবসগুলোকে শোভিত করতেন—অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সাথে তিনি সেহরি ও ইফতার গ্রহণ করতেন। রোজা ভাঙার সময় হলে দ্রুত ইফতার করে নিতেন, পক্ষান্তরে সেহরি করতেন অনেক দেরিতে, সুবহে সাদিকের কিছু পূর্বে সেহরি সমাপ্ত করতেন। ইফতার করতেন ভেজা বা শুকনো খেজুর, অথবা পানি দিয়ে। ভেজা খেজুর দিয়ে সেহরি করাকে পছন্দ করতেন তিনি। জাঁকজমকহীন স্বাভাবিক সেহরি ও ইফতার গ্রহণ করতেন সর্বদা।

রমজানে রাসূলের এ আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায়—আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان النبي صلي الله عليه و سلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পূর্বে কয়েকটি ভেজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, যদি ভেজা খেজুর না থাকত, তবে সাধারণ শুকনো খেজুরই গ্রহণ করতেন। যদি তাও না থাকত, তবে কয়েক ঢোক পানিই হত তার ইফতার।[1]

আবু আতিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং মাসরুক আয়েশা রা.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। মাসরুক তাকে উদ্দেশ্য করে বলল : মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' সাহাবি উপস্থিত হয়েছে, যাদের কেউ কল্যাণে পশ্চাৎবর্তী হতে আগ্রহী নয় ; তাদের একজন মাগরিব ও ইফতার উভয়টিকেই বিলম্ব করে, অপরজন দ্রুত

---

[1] তিরমিজি : ৬৯৬, হাদিসটি সহি। উপরোক্ত কিছুই যদি না থাকে, তবে রোজাদার যে কোন হালাল খাদ্য দিয়ে ইফতার করে নিবে। তবে, খাদ্যই যদি না থাকে, তাহলে ইফতারের নিয়ত করবে। ইফতারের নিয়তই হবে তার জন্য ইফতার।

করে মাগরিব ও ইফতার। আয়েশা বললেন : কে মাগরিব ও ইফতার দ্রুত করে ? বললেন : আব্দুল্লাহ। আয়েশা উত্তর দিলেন : রাসূল সা. এভাবেই রোজা পালন করতেন।[1]

আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا! قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً!، قال: انزل فاجدح لنا!، قال: فنزل فجدح، فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم

একবার, রমজান মাসে আমরা রাসূলের সাথে সফরে ছিলাম। সূর্য অস্তমিত হলে তিনি বললেন, হে অমুক ! নেমে এসে আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশ্রিত ইফতার পরিবেশন কর। লোকটি বলল : হে আল্লাহর রাসূল ! এখনও তো দিবসের কিছু বাকি আছে। রাসূল পুনরায় বললেন : নেমে এসে আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশ্রিত ইফতার পরিবেশন কর। বর্ণনাকারী বলেন : সে নেমে এসে ছাতু ও পানির ইফতার প্রস্তুত করে রাসূলের সামনে উপস্থিত করলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। অত:পর তিনি হাতের ইশারা দিয়ে বললেন : সূর্য যখন এখান থেকে এখানে অস্ত যাবে এবং রাত্রি আগত হবে এতটুকু অবধি, তখন রোজাদার রোজা ভাঙবে।[2]

জনৈক সাহাবির সূত্র ধরে আব্দুল্লাহ বিন হারেস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলের নিকট হাজির হলাম, তিনি সেহরি খাচ্ছিলেন। রাসূল বললেন : নিশ্চয় তা বরকত স্বরূপ, আল্লাহ পাক বিশেষভাবে তা তোমাদেরকে দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর না।[3]

---

[1] মুসলিম : ১০৯৯।

[2] বোখারি : ১৯৪১, মুসলিম : ১১০১।

[3] নাসায়ি : ২১৬২, হাদিসটি সহি।

যায়েদ বিন সাবেত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমারা রাসূলের সাথে সেহরি খেলাম, অত:পর তিনি সালাতে দণ্ডায়মান হলেন। আমি বললাম : সেহরি ও আজানের মধ্যবর্তী সময়ের স্থায়িত্ব কতটা ? তিনি বললেন : পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত পরিমাণ দৈর্ঘ্য।[1] বিলম্বে সেহরি গ্রহণ রোজার জন্য সহজ, রোজাদারের জন্য প্রশান্তিকর ; এবং বিলম্বে সেহরি গ্রহণের কারণে ফজরের সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মোমিনের উত্তম সেহরি শুকনো খেজুর।[2]

আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم –وذلك عند السحور–: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئاً، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেহরিকালিন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—হে আনাস, আমি রোজা রাখতে আগ্রহী। আমাকে কিছু আহার করাও। আমি তার সামনে শুকনো খেজুর এ একটি পাত্রে পানি উপস্থিত করলাম। বেলালের (প্রথম) আজানের পর তিনি সেহরি গ্রহণ করেছিলেন।[3]

উপরোক্ত হাদিসগুলো সামনে রেখে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রাসূল ইফতার করতেন দ্রুত—আনাস রা.-এর স্পষ্ট হাদিস এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তিনি বলেন : আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, এমনকি এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও, ইফতার করা ব্যতীত মাগরিবের সালাত আদায় করতে দেখিনি।[4]

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল বলেছেন—

---

[1] বোখারি : ১৯২১।

[2] আবু দাউদ : ২৩৪৫, হাদিসটি সহি।

[3] নাসায়ি : ২১৬৭, হাদিসটি সহি।

[4] ইবনে হিব্বান : ৩৫০৪, শাইখাইনের শর্ত অনুসারে হাদিসটির সূত্র বর্ণিত।

تسحروا ولو بجرعة من ماء

এক ঢোক পানি দ্বারা হলেও, তোমরা সেহরি গ্রহণ কর।[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবুদিয়ত ও দাসত্বের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা পেরুনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সাধ্যানুসারে যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করে কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কীভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান যাপন করেছেন, সানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে আমরা যদি তা বিবেচনা করি, তবে দেখতে পাব, রোজাদারদের যারা সেহরি গ্রহণ করেন না, বা করলেও, সম্পন্ন করেন অনেক দ্রুত—মধ্যরাতে, তারা অবশ্যই সুন্নতের সঠিক পথ-বিচ্যুত। দ্রুত সেহরি গ্রহণের কারণে নফ্‌সকে অযথা ভোগানো হয়। মূলত: রাসূল আমাদের জন্য হেদায়েতের যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তার পুণ্যবান সহচরগণ সমুন্নত করেছেন যে আদর্শ ও কর্মনীতির মৌল-পন্থা, তার অনুসরণ ও অনুবর্তনেই সাফল্য ও কল্যাণ। আমর বিন মায়মুন রা. বলেন : মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ ছিলেন সকলের চেয়ে সর্বাধিক দ্রুত ইফতারকারী, এবং বিলম্বে সেহরি গ্রহণকারী।[2]

বর্তমান সময়ে ইফতার ও সেহরিকে কেন্দ্র আমরা যে জাঁকজমক ও আচার-অনুষ্ঠান দেখতে পাই, রাসূল কোনভাবেই এর বৈধতা প্রদান করেননি। অতিরিক্ত ভোজন ও বিলাসী আহারের ফলে নফ্‌স অলসতায় আক্রান্ত হয়, এবাদতের ক্ষেত্রে তার মাঝে সীমাহীন শৈথিল্য ছড়িয়ে পড়ে। সে তাই, বঞ্চিত হয় এ মহান মৌসুমের প্রকৃত ফললাভে। দু:খজনক বিষয় এই যে, কোথাও কোথাও দেখা যায়, মানুষ হারাম ও অবৈধ খাদ্য দিয়ে ইফতার ও সেহরি গ্রহণ করছে, সেহরি ও ইফতারের

---

[1] ইবনে হিব্বান : ৩৪৭৬, হাদিসটি হাসান।

[2] আব্দুর রাজ্জাক : ৭৫৯১

পিছনে ব্যায় করছে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ। মানুষ কতটা নির্বিকার হয়ে পড়েছে, এগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মানুষ সতত ধোঁকায় আক্রান্ত নিজেকে নিয়ে ; নিজেকে সে বঞ্চিত করছে এমন সৌভাগ্য ও অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি থেকে, যা হতে পারত তার নাজাতের উপকরণ, পরকালিন দরজা বুলন্দীর কারণ। যেদিন কাজে আসবে না পাহাড়সম সম্পদ, একপাল সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ যাকে বিশুদ্ধ অন্তরে শোভিত করেছেন, কেবল তার ললাটেই শোভা পাবে মুক্তির সৌভাগ্য। ইহকালিন নশ্বর কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষ ত্যাগ করছে-হেলায় হারাচ্ছে পরকালিন অবিনশ্বর প্রাপ্তিকে, এবং রমজান মাসে রাসূল নির্দেশিত কর্মপন্থা ও আহার-ভোজনের নীতিমালা অনুসরণ না করে—আল্লাহর সাথে এবাদতের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি, পাপাচার-অনাচারে আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও—আক্রান্ত হয় নানারকম দৈহিক অসুস্থতা, স্বাস্থ্যহানিতে, যার জের টানতে হয় দীর্ঘ সময়।

আত্মার প্রবঞ্চনা ও মোহ হতে যে সতর্ক সতত, নিজেকে তার রক্ষা করাই কাম্য। সময় বয়ে যাচ্ছে নিরবধি, সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে ক্রমাগত, যে কর্ম পরকালে কাজে আসবে, বয়ে আনবে মহান ফলাফল, তা ক্রমে নিঃশেষ তলানিতে এসে ঠেকছে। রাসূলের পুণ্যময় আচরণ ও জীবনাচারের যে আলো আমাদের স্পর্শ করেছে, তা নিয়েই যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে প্রয়াসী, রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুবর্তনই যার ইহকালীন একমাত্র অবলম্বন, পার্থিব আস্বাদকে ছুঁড়ে মারা তার দায়িত্ব; আলস্য পরিহার করে ধর্মের মৌলিক এবাদতে নিজেকে নিয়োগ করা, সৌভাগ্যের অনুষঙ্গের মাধ্যমে আত্মায় ও মননে শোভিত হওয়া, এবং অধিক-হারে কল্যাণ-কর্মে ব্রতী হওয়া তার একমাত্রিক কর্তব্য।

ইফতার কালে রাসূল সা.-এর দোয়া

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا أفطر قال: ذَهَبَ الظَمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, (ইফতার সেরে) বলতেন—পিপাসা নিবারিত হয়েছে, নিষিক্ত হয়েছে নালিগুলো আর আল্লাহ চাহে তো পুরস্কারও নির্ধারিত হয়েছে।[1] [2]

পক্ষান্তরে, আমাদের বর্তমান সমাজে দেখতে পাই, ইফতার কালে আহার-ভোজন অনুষ্ঠানের ফলে অধিকাংশ রোজাদারই দোয়ার বিষয়টি বিস্মৃত হন, ভুলে যান রোজা শেষে আল্লাহর দরবারে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে। বিশেষত, নানা আয়োজনে অন্তপুরে ব্যস্ত থাকেন যে নারীরা, তাদের কথা বলাই বাহুল্য। এভাবে, রোজাদারগণ দোয়া কবুলের মহত্তম সময়গুলো হেলায় হারান।

রোজা অবস্থায় মেসওয়াক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রেখেও মেসওয়াক করতেন। আমের বিন রাবিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল

---

[1] আবু দাউদ : ২৩৭৫, হাদিসটি হাসান।

[2] ইফতারের পূর্বে অপেক্ষাকালীন সময়ে এই দোয়া পাঠ করবে—

اللّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

হে আল্লাহ ! আমি আপনার করুণার মাধ্যমে—যে করুণা পরিব্যাপ্ত করে আছে সব কিছু—আপনার মাগফেরাত কামনা করছি। (ইবনে মাজা : খণ্ড : ১, হাদিস নং ৫৫৭)

ইফতার অন্যান্য খাবার গ্রহণকালীন অনুরূপ بسم الله বলে আরম্ভ করবে। যদি কারো মেহমানদারিতে উপস্থিত হয়, তবে এই দোয়া পাঠ করবে—

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلاَئِكَةُ

তোমাদের নিকট রোজাদারগণ ইফতার করেছে, এবং তোমাদের খাবার গ্রহণ করেছে সজ্জনগণ, আর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেছে।

(আবু দাউদ : ৩৩৫৬)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্যবার রোজাবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি।[1]

মেসওয়াকের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদিসে এসেছে—

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

অর্থাৎ, মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী।[2]

অপর হাদিসে এসেছে—

لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سيترل به علي قرآن أو وحي.

মেসওয়াকের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, এমনকি, একসময় আমার মনে হয়েছিল যে, এ ব্যাপারে আমার উপর কোরআন কিংবা ওহি নাজিল হবে।[3]

স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো দিবস জুড়েই মেসওয়াক করতেন। দিবসের সূচনা বা সমাপ্তির মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য করতেন না। হাদিসে এসেছে—

لولا أن أشق على أمتي لأمرقهم بالسواك مع كل وضوء

আমার উম্মতের উপর যদি বিষয়টি কঠিন না হত, তবে প্রতি ওজুর সময় তাদের জন্য মেসওয়াক আবশ্যক করে দিতাম।[4]

---

[1] তিরমিজি : ৭২৫, হাদিসটিকে তিনি হাসান বলেছেন। হাদিসটি অনুসারেই আমল করা হবে। রোজা অবস্থায় মেসওয়াককে কেউ দুষণীয় মনে করেননি। তবে, কেউ কেউ কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াককে মাকরূহ মনে করেছেন। এমনিভাবে, মাকরূহ মনে করেছেন দিবস শেষে মেসওয়াক করাকে।

[2] আহমদ : ৭, হাদিসটি সহি লিগায়রিহ।

[3] আহমদ : ২২/৩।

[4] আহমদ : ৯৯৩০।

অপর হাদিসে এসেছে—

لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

মোমিনদের জন্য যদি কষ্টকর না হত, তবে প্রতি নামাজের কালে আমি তাদের জন্য মেসওয়াক আবশ্যক করে দিতাম।[1]

ইবনে আব্দুল বার বলেন : এ হাদিস প্রমাণ করে, যে কোন সময় মেসওয়াক বৈধ। হাদিস দুটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'প্রতি ওজুকালে' এবং 'প্রতি নামাজ কালে' বাক্যাংশ দুটি ব্যবহার করেছেন। নামাজ নির্দিষ্ট একটি সময়েই নয়, ওয়াজিব হয় দ্বিপ্রহর, বিকেল ও রাতের নানা সময়ে।[2]

ইমাম বোখারির উক্তি—রোজাদারকে এ হুকুমের আওতা-বহির্ভূত করা হয়নি।[3]

ইবনে খুযাইমা বলেন : হাদিসটিতে প্রমাণ হয় স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির জন্য যেভাবে প্রতি নামাজের সময় মেসওয়াক করা ফজিলতের বিষয়, তেমনিভাবে ফজিলতের বিষয় রোজাদারের জন্যও।[4] সুন্নতের অনুসারীগণের অবশ্য কর্তব্য বিষয়টির প্রতি যত্নশীল হওয়া। কারণ, এর প্রতিদান অঢেল, উপকারিতা অগণিত।

রাসূলের অন্য হাদিসে বর্ণিত একটি উক্তি এ ক্ষেত্রে কোন জটিলতা তৈরি করবে না, উক্তিটি হচ্ছে—

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

---

[1] মুসলিম : ২৫২।

[2] ইবনে আব্দুল বার, আত তামহিদ : খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯৮।

[3] বোখারি।

[4] ইবনে খুযাইমা : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৭।

মেশকের সুঘ্রাণের চেয়েও আল্লাহর নিকট রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ অধিক প্রিয়।[1]—কারণ, হাদিসটির অর্থ হচ্ছে, রোজাদারের মুখের এ গন্ধ, যাকে তোমরা দুর্গন্ধ বলে অবহিত কর, আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের চেয়েই উত্তম, ভালো ও প্রিয়—যাকে তোমরা সুগন্ধি বল। কারণ, এ গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে তার এবাদত পালন ও আল্লাহ তাআলার হুকুমের অনুবর্তী হওয়ার ফলে। মুখের গন্ধ মৌলিকভাবে প্রিয় ও ভালো নয়, এবং তা দূর করার ব্যাপারে বান্দার উপর কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই।

ভেজা ও শুকনো মেসওয়াকের মাঝে রাসূল পার্থক্য করেছেন, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তাই, সালাফের অধিকাংশই এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতেন না। ইবনে সীরীনের নিকট আগমনকারী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন : ...এতে কোন অসুবিধা নেই, এ কেবল খেজুরের ডাল, এর স্বাদ রয়েছে। যেমন স্বাদ রয়েছে পানির, অথচ তা দিয়ে তুমি কুলি কর।[2] ইবনে উলয়া বলেন : রোজাদার কিংবা পানাহারকারী—উভয়ের জন্যই মেসওয়াক করা সুন্নত। শুকনো কিংবা ভেজা মেসওয়াক—দুটোই এ ক্ষেত্রে বরাবর।[3]

---

[1] বোখারি : ১৮০৫। এ হাদিসটির ফলে একদল মনে করেন, দিবসের শেষে মুখের দুর্গন্ধ যাতে দূর না হয় তাই মেসওয়াক করা মাকরূহ। দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকার ফলে দিবসের শেষান্তে রোজাদারের মুখ দুর্গন্ধে ভরে যায়। রোজাদারের ক্ষেত্রে মেসওয়াকের মাসআলায় উলামাগণ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, কেউ মনে করেন : শর্তহীনভাবেই রোজাদার ব্যক্তি মেসওয়াক করতে পারবেন। কেউ বলেন : সূর্য হেলে পড়ার পর মেসওয়াক করা মাকরূহ, এরপূর্বে মোস্তাহাব। কেউ বলেন : কেবল আসরের পরই মেসওয়াক করা মাকরূহ হবে, অন্য সময় নয়। অপর কারো মত এই যে, বিষয়টিকে ফরজ ও নফলের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দেখা হবে। রোজা যদি ফরজ হয়, তবে সূর্য হেলে পড়ার পর হবে মাকরূহ, নফলের ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। কারণ, এ পদ্ধতিটিই রিয়া হতে অধিক মুক্ত। প্রথম মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। দ্র : ইবনে আব্দুল বার রচিত তামহিদ ১৯/৫৭, আইনি রচিত উমদাতুল ক্বারী ১৬/৩৮৪।

[2] ইবনে আবি শায়বা : ৯১৭১।

[3] ইবনে আব্দুল বার : তামহিদ ৭/১৯৯

রাতে অপবিত্র অবস্থায় রোজার নিয়ত করা

রাসূল কখনো কখনো রাতে অপবিত্র অবস্থাতেই রোজার নিয়ত করে নিতেন। বিষয়টির প্রমাণ রাসূলের সহধর্মিণী উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিস—

كان النبي صلى الله عليه و سلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، فيغتسل ويصوم.

রমজান মাসে স্বপ্নদোষ ব্যতীতই অপবিত্র অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে অতিক্রম করতেন। অত:পর তিনি গোসল করে রোজা রাখতেন।[1]

রাসূলের অপর স্ত্রী উম্মুল মোমিনীন উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেন:—

كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.

সহবাসের ফলে না-পাকি অবস্থায় রাসূল সুবহে সাদিক অতিক্রম করতেন, অত:পর গোসল করে রোজা রাখতেন।[2]

একই হুকুম-ভুক্ত হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারীরা। ফজর হওয়ার পূর্বেই যদি তারা পবিত্র হয়ে যায়, তবে গোসল না করেই নিয়ত করে নিবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মাথায় পানি দেয়া

অসহনীয় তাপমাত্রা দেখা দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় পানি ঢালতেন। আবু বকর বিন আব্দুর রহমান হতে

---

[1] বোখারি : ১৮২৯, মুসলিম : ১১০৯।

[2] বোখারি : ১৯২৬

বর্ণিত, রাসূলের কয়েকজন সাহাবির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন : আরজে (স্থান বিশেষ) অত্যধিক পিপাসা বা তাপমাত্রার ফলে রাসূলকে দেখেছি যে, তিনি মাথায় পানি ঢালছেন।[1]

দৈহিক প্রশান্তি ও স্বস্তি এবং উদ্যম লাভের জন্য এমন করা দূষণীয় নয়। এর ফলে রোজাদারের এবাদত বৃদ্ধি পাবে। কারণ, বান্দা স্বতঃস্ফূর্ত ও সানন্দচিত্তে বিনয়-বিগলিত হয়ে রবের দরবারে উপস্থিত হবে, পালন করবে তার আদেশ-নিষেধ—রোজার প্রধান উদ্দেশ্য এটিই। দৈহিক কষ্টভোগ, নির্যাতন কিংবা কঠোরতা আরোপ রোজা রাখার উদ্দেশ্য হতে পারে না কখনো।

পূর্ণ গোসল, কাপড় ভেজানো, পানিতে ডুব দেয়া—সবই মাথায় পানি ঢালার হুকুম-ভুক্ত, যেমন উল্লেখ করেছেন ইমাম বোখারি তার সহি গ্রন্থে। কয়েকজন সাহাবি ও তাবেইনের উদ্ধৃতি সহ—যারা ছিলেন অনুবর্তনের ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ অনুসারী—তিনি গোসল বিষয়ক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, ইবনে উমর রা. একটি কাপড় পানিতে ভিজিয়ে শরীরে জড়িয়ে নিলেন। তিনি ছিলেন রোজাদার। শা'বী রোজা রেখেই গোসলের জন্য হাম্মামে প্রবেশ করেন। হাসান বলেন : কুলকুচা কিংবা শীতলতা গ্রহণ রোজাদারের জন্য দূষণীয় নয়। ইবনে মাসঊদ বলেন : তোমাদের যে রোজা রাখবে, সে যেন তৈলযুক্ত, বিন্যস্ত কেশবিন্যাস নিয়ে সকাল যাপন করে। আনাস বলেন : আমার একটি টব রয়েছে, রোজা রেখেই আমি তাতে প্রবেশ করি।[2] এগুলোর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে এ-সি রুমে সময় কাটানো একই হুকুম ভুক্ত ধরা হবে।

এ ক্ষেত্রে মৌলিক ও সাধারণ নীতিমালা হল, ব্যক্তির জন্য এবাদত পালন যা সহজ করে দেয়, স্বতঃস্ফূর্ত-উদ্যমী ও প্রশান্ত মন নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে যা সহায়ক, তা করা

[1] আবু দাউদ : ২৩৬৫। হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮০-৬৮১

রোজাদারের জন্য বৈধ। যে পরিশ্রম ও কষ্টভোগের ফলে এবাদত হতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিধায়কের পক্ষ হতে তাকে কখনো উদ্দিষ্ট করা হয়নি, তাকে বরং, ত্যাগ ও এড়িয়ে যাওয়াই কাম্য। তবে, যে কষ্টভোগের ফলে এবাদত হতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাকে মেনে নেওয়া উত্তম। কারণ, তা এবাদতের বিনিময় বৃদ্ধি করে, যেমন অধিক শীতেও ওজু করা, হজের জন্য সফর, অত্যধিক শীত বা গরম সত্ত্বেও জামাতে সালাত আদায়ের জন্য গমন।

এই প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন : এ স্থলে যা জ্ঞাতব্য, তা এই যে, অযৌক্তিকভাবে আত্মাকে কষ্টদান কিংবা কঠোরতা আরোপ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের উপায় হতে পারে না। অধিকাংশ মূর্খ যেমন ভেবে থাকে যে, আমল যত কঠিন, পুরস্কারও তত বিপুল। তাদের ধারণা, কষ্টের মাত্রা অনুসারে প্রতিফল নির্ধারিত হয়। প্রতিফল, বরং, নিরূপিত হয় আমলের উপকারিতা, কল্যাণ ও পরিণতি হিসেবে। বান্দা যতটা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যে নিজেকে লীন করবে, তার আমল সে অনুসারে গ্রহণযোগ্য হবে। এ দু প্রকার আমলের মাঝে যা হবে সুন্দর, সুষম, এবং যে আমলকারী হবে অধিক অনুগত, তবে—সন্দেহ নেই, তার আমলই আল্লাহ পাক কবুল করবেন। সংখ্যাধিক্যের বিচারে আমলের মাঝে প্রবৃদ্ধি আসে না, বরং, তা সমৃদ্ধ হয় আমলকালীন অন্তরের অবস্থা অনুসারে।[1]

শরিয়তের পরিধি খুবই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সার্বিক বিবেচনায় তা খুবই সহজ ও সরল এবং অনায়াস সাধ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন হেদায়েতের যে আলোকবর্তিকা, আত্মাকে কষ্টদান ও এ জাতীয় বিষয় তার স্পষ্ট বিরোধী।

কুলকুচা করা ও নাকে পানি দেয়া

[1] ইবনে তাইমিয়া : মাজমুউল ফাতাওয়া : খণ্ড : ২৫, পৃষ্ঠা : ২৮১-২৮২

রোজা অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুলকুচা করতেন, পানি দিতেন নাকে। তবে নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। লাকিত বিন সাবরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিষয়টিকে প্রমাণ করে ; তিনি বলেন :—

... فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء!، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

...আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে ওজু বিষয়ে শিক্ষা দিন ! তিনি বললেন, তুমি ওজু করবে পূর্ণাঙ্গরূপে, খেলাল করবে আঙুলগুলো। যদি রোজাদার না হও, তবে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে গভীরে পৌঁছে দেবে।[1]

মধ্যপন্থা অবলম্বনের এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছন্নতা ও সিয়ামের নীতিমালা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য অতুলনীয় সমন্বয় সাধন করেছেন। কোন একদিকে অতিরঞ্জনের ন্যূনতম সুযোগ রাখেননি।

রাসূল সা.-এর সওমে ওসাল২

রাসূল কখনো কখনো রাত-দিন পূর্ণ সময় অনাহারে কাটাতেন এবং রোজা পালন করতেন। পুরো সময় যেন আল্লাহর এবাদতে পালিত হয়—সওমে ওসাল পালনের মাধ্যমে এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য।[2] প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদিস এ স্থানে উল্লেখ্য : আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :—

لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟!، قال: لست كأحد منكم؛ إني أُطعم وأُسقى -أو إني أبيت أُطعم وأُسقى-

[1] আবু দাউদ : ১৪২, হাদিসটি সহি।

[2] দ্র : ইবনে কায়্যিম, যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২

তোমরা সওমে ওসাল (রাত-দিন একত্রে রোজা) পালন কর না। সাহাবিগণ বললে, আপনি তো তা পালন করেন ?! তিনি উত্তরে বললেন : আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে, আত্মিক ভাবে) পানাহার করানো হয়, আমি রাত যাপন করি পানাহার করানো অবস্থায়।[1]

আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা ওসাল করতে বারণ করেছেন। মুসলমানদের একজন তাকে প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি তো তা করেন ? উত্তরে রাসূল বললেন : তোমাদের কেউ কি আমার অনুরূপ ? আমি রাতযাপন কালে আল্লাহ আমাকে পানাহার করান। যখন তারা ওসাল করতে নাছোড় হল, তখন রাসূল তাদের সাথে একদিন সওমে ওসাল করলেন, অত:পর আরেকদিন করলেন। এরপর চাঁদ উঠল। অত:পর রাসূল বললেন : যদি চাঁদ উঠতে আরো বিলম্ব হত, তবে আমি আরো বৃদ্ধি করতাম। সওমে ওসালের ব্যাপারে তারা নাছোড় হলে রাসূল তাদের তিরস্কার করে এমন বলেছিলেন।[2]

উল্লেখিত হাদিসগুলোর পর্যালোচনায় প্রমাণ হয়, সওমে ওসাল একমাত্র রাসূলের জন্য বিশিষ্ট ; অন্য কারো জন্য তা পালন বৈধ নয়। তবে, কেউ যদি একান্তভাবে তা পালন করতে চায়, তাহলে সেহরি অবধি বিলম্বিত করার বৈধতা রয়েছে। এক হাদিসে এসেছে, রাসূল বলেন :—

لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.

তোমরা সওমে ওসাল কর না, কেউ যদি ওসাল করতে আগ্রহী হয়, তবে সে যেন সেহরি অবধি করে।[3]

---

[1] বোখারি : ১৯৬১।

[2] বোখারি : ১৯৬৫।

[3] বোখারি : ১৮৬২।

সেহরি অবধি ওসাল করার ক্ষেত্রে কেবল বৈধতা প্রদান করা হয়েছে, উৎসাহ কিংবা সম্মতি দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন হাদিসে, কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ইফতার করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। সাহল বিন সাআদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল বলেছেন :—

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

মানুষ যতক্ষণ দ্রুত (সময় হওয়া মাত্রই) ইফতার করবে, ততক্ষণ ভালো থাকবে।[1]

রাসূলের উক্তি—إني أبيت يطعمني ربي ويسقين—সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের উক্ত খাদ্য ও পানীয় ছিল ইন্দ্রিয়গত, অনুভবীয়। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিকভাবে নয়, তাকে সরাসরি খাদ্যই প্রদান করা হত। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি, হাদিসের বাহ্যিক শব্দ-প্রয়োগ এ অর্থই বহন করছে, সুতরাং, তা থেকে সরে এসে ভিন্ন কোন অর্থ নেওয়ার মানে নেই।

অপর কেউ বলেন : এ আহার কোনভাবেই ইন্দ্রিয়গত বা অনুভবীয় ছিল না। বরং, আল্লাহ তাকে আপন জ্ঞানভান্ডার হতে তাকে যে মহান তত্ত্ব দান করতেন, মোনাজাতের মাধ্যমে অপার আস্বাদ, ভালোবাসা, এবং আল্লাহ তাআলার পরম নৈকট্যের যে ভূষণে তাকে শোভিত করতেন, এ তারই প্রতি ইঙ্গিতসূচক। যদি তাকে আমরা ইন্দ্রিয়গত ও অনুভবীয় পানাহার হিসেবেই সাব্যস্ত করি, তবে তাতে রাসূলের অক্ষমতাই কেবল প্রকাশ পাবে, সওমে ওসাল পালনকারী বলা হবে না। শেষোক্ত মতকেই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও এবাদতে নিজেকে লীন করে দেওয়া, প্রবৃত্তীয় যাবতীয় লালসা ও আকাঙ্ক্ষা হতে

---

[1] বোখারি : ১৮৫৬।

মুক্ত থেকে আল্লাহকে ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে যাপন করা বান্দার জন্য নির্মাণ করে এক অপার্থিব রক্ষাব্যুহ, যা ভেদ করে শয়তানি শত্রু তাকে আক্রান্ত করতে পারে না কোনভাবে, এর ফলে প্রবৃত্তিজাত দৌর্বল্যগুলো মানুষ অতি সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে। মানুষ যতটা পরিমাণে দৈহিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো এড়াতে পারবে, দমন করতে পারবে প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা, সাফল্যের পালক ততটাই বৃদ্ধি পাবে তার হিসেবের খাতায়, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায় বলীয়ান হয়ে উঠবে। রোজা তার জন্য, তখন, হবে রক্ষাকবচ—যাবতীয় পাপ ও গোনাহ হতে।

রাসূল সওমে ওসাল পালন করতেন, যা ছিল তার জন্য মোস্তাহাব আমলের তুলনায় ঊর্ধ্বের। এ পালন প্রমাণ করে, তার মানসিকতা ছিল অধিক কল্যাণব্রতিতায় নিরত, নফ্‌সকে প্রবৃত্তির বন্ধ্যাত্ব হতে মুক্ত রাখবার জন্য আত্মমগ্ন। তার আত্মা সন্তোষ প্রকাশ করত প্রয়োজনীয় পার্থিব আস্বাদ পেয়ে এবং মুক্ত থাকত যাবতীয় গাফলত ও উদাসীনতা হতে। তিনি পার্থিব যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে স্রষ্টার জন্য সর্বোত্তম সময়টুকু বের করে আনতেন, মগ্ন হতেন তাতে তার এবাদতে। তার এ মানসিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ছিল রমজান মাসে, যে মাস রহমত-বরকতের মাস, এবাদত ও যুহুদ পালনের মহত্তম মৌসুম।

সওমে ওসাল ইঙ্গিত করে, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো বান্দার জন্য এমন কর্মের আদেশ প্রদান করেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকে মনে হবে অনুপযোগী, মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতিকুল—খোলা চোখে যার যৌক্তিকতা আমাদের কাছে ধরা দেয় না।

রাসূলের, স্বয়ং ওসাল করা সত্ত্বেও, সাহাবিদের ওসাল হতে বিরত থাকার আদেশ প্রদান প্রমাণ করে, উম্মতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই দয়ার্দ্র চিত্তের, ও সহনশীল। নিষেধ ব্যতীত সাহাবিগণ তার কর্মের পূর্ণ অনুবর্তনে ছিলেন ব্রতী, তার অনুসরণে আত্মনিয়োগকারী।[1]

---

[1] ইবনে হাজার : ফাতহুল বারি : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৯

রমজানে সফর করা, রোজা রাখা কিংবা ভঙ্গ করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে সফর করতেন ; সফরে তিনি কখনো কখনো রোজা পালন করতেন, কখনো ত্যাগ করতেন, এবং পানাহার করতেন, অন্যদেরও আদেশ দিতেন রোজা ভঙ্গের। এ ব্যাপারে নানা হাদিস পাওয়া যায়—ইবনে আব্বাস হতে তাউস বর্ণনা করেন : রাসূল রমজানে রোজা পালনরত অবস্থায় সফরে বের হলেন, পথে উসফান নামক এলাকায় পৌঁছে পানিপাত্র আনার নির্দেশ দিলেন। লোকদের দেখানোর জন্য তিনি প্রকাশ্যেই পানি পান করলেন। মক্কায় পৌঁছা অবধি তিনি পানাহার করতে থাকলেন। ইবনে আব্বাস বলতেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে সফররত অবস্থায় রোজা পালন করেছেন এবং ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং, যার ইচ্ছা রোজা রাখবে, যার ইচ্ছা ভঙ্গ করবে।[1]

রমজানে সফররত অবস্থায় রাসূলের রোজা রাখা এবং ভঙ্গ করার বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদি কষ্টের সম্ভাবনা না থাকে, রোজা ভাঙ্গার মত কিছু না ঘটে, তবে রোজা রাখাই উত্তম। কারণ, রাসূল এমনই করেছেন। আবু দারদার হাদিসে এসেছে—তিনি বলেন: প্রচণ্ড তাপে আমরা রাসূলের সাথে রমজানে সফরে বের হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ অধিক তাপের ফলে মাথায় হাত দিচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউ রোজাদার ছিলেন না।[2] হাদিসটি প্রমাণ করে, সম্ভব হলে রোজা পালনই উত্তম। এর মাধ্যমে বান্দা দ্রুত দায়-মুক্ত হবে, রোজা পালন করতে পারবে সঠিক সময়ে, সকলের সাথে একই সময়ে রোজা রাখার ফলে বিষয়টি তার জন্য সহজ হবে।

---

[1] বোখারি : ৪২৮৯।

[2] মুসলিম : ১১২২

তবে, রোজা ভাঙ্গার মত যদি কোন কারণ থাকে, তবে রোজা না রাখাই উত্তম। এক হাদিসে রাসূল এরশাদ করেন :—

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.

আল্লাহ পছন্দ করেন তার প্রদত্ত রুখসত যাপন করা, যেমন অপছন্দ করেন তার পাপে লিপ্ত হওয়া।[1]

কখনো কখনো, বরং, এ অবস্থায় রোজা রাখা মাকরূহ। কারণ, মক্কা অভিযান কালীন রমজান মাসে রাসূল রোজা পালন করেননি। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রোজা পালনরত অবস্থায় রাসূল কুদাইদ ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী প্রস্রবনে অবতীর্ণ হয়ে রোজা ভেঙে ফেললেন, মাস শেষ হওয়া অবধি তিনি এভাবেই পানাহার করে চললেন।[2]

আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে ছিলাম, আমাদের মাঝে অধিক ছায়া গ্রহণকারী ছিল সে ব্যক্তি, যে তার কাপড় দিয়ে ছায়া নিচ্ছিল। যারা রোজাদার ছিল তারা কিছুই করল না, আর যারা পানাহার করেছিল, তারা বাহন হাঁকাল, কাজে আত্মনিয়োগ করল, এবং প্রচুর পরিশ্রম করল। রাসূল বললেন : পানাহারকারীগণ আজ সওয়াব নিয়ে গেছে।[3]

যদি রোজা পালন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, এবং পানাহার আবশ্যক হয়, তবে পানাহার বাধ্যতামূলক। কারণ, রাসূল এমন কঠিন অবস্থায় রোজা পালনকারীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

أولئك العصاة، أولئك العصاة.

এরা পাপী, এরা পাপী।[4]

---

[1] আহমদ : ৫৮৬৬, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ৪২৭৫।

[3] বোখারি : ২৭৩৩।

[4] মুসলিম : ১১১৪।

এক ব্যক্তি, যে এমন কঠিন দু:সাধ্য সময়ে রোজা রেখেছিল, তাকে ঘিরে ছিল একদল লোক, এবং ছায়া দিচ্ছিল ; দেখে রাসূল বললেন :

ليس من البر الصيام في السفر.

(এভাবে) সফরে রোজা পালন কোন পুণ্যের কাজ নয়।[1]

আবু সাঈদ খুদরি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রোজা পালনরত অবস্থায় আমরা রাসূলের সাথে মক্কায় সফরে বের হলাম। এক স্থানে যাত্রা বিরতিকালে রাসূল বললেন : তোমরা শত্রুব্যূহের কাছাকাছি পৌঁছে গেছ, পানাহার তোমাদেরকে শারীরিকভাবে সবল করে তুলবে। সুতরাং, আমাদের রুখসত প্রদান করা হয়েছিল। আমাদের কেউ রোজা রেখেছিল, পানাহার করেছিল কেউ কেউ। অত:পর ভিন্ন এক স্থানে উপনীত হলে রাসূল আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমরা ভোরে শত্রুর মুখোমুখি হবে, পানাহার হবে তোমাদের জন্য বলদায়ক, সুতরাং, তোমরা পানাহার কর। পানাহার ছিল বাধ্যতামূলক। তাই আমরা সকলে পানাহার করলাম। তিনি বলেন : এরপর আমরা অনেকবার রমজানের সফরে রাসূলের সাথে রোজা রেখেছি।[2] ইবনে কায়্যিম বলেন : পানাহারের জন্য বাসস্থান অতিক্রম করতে হবে রাসূল এমন বলেননি, এ ব্যাপারে রাসূল থেকে সহি কিছুই পাওয়া যায় না।[3]

---

[1] আবু দাউদ : ২৪০৭।

[2] মুসলিম : ১১২০।

[3] যাদুল মাআদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫-৫৬। পূর্ণ উদ্ধৃতিটি এরূপ...সাহাবিগণ যখন সফরের সূচনা করতেন, গৃহ প্রাঙ্গন অতিক্রম ব্যতীতই পানাহার করে নিতেন। তারা একে রাসূলের সুন্নত মনে করতেন। ... মোহাম্মদ বিন কাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রমজানে আনাস বিন মালেকের নিকট আগমন করলে দেখতে পেলাম তিনি সফরে মনস্থ হয়েছেন, তার ঘোড়া প্রস্তুত হয়েছে, পরিধান করেছেন তিনি সফরের পোশাক। তিনি খাবারের নির্দেশ দিলেন এবং খাদ্য গ্রহণ করলেন, আমি বললাম : এটাই কি সুন্নত ? তিনি বললেন, হ্যা, সুন্নত। অত:পর তিনি সফরে বের হলেন।

আমাদের মতে, এ মত ব্যক্তিগতভাবে আনাস রা.-এর। সফরের সূচনা ব্যতীত কেউ রুখসত পালন করতে পারবে না। কারণ, রাসূলের অসংখ্য সফরের কোথাও আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই না। এবং কোরআনে এসেছে—

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤]

তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, ভিন্ন সময় রোজা রেখে নিবে।[1] যে সফরের সূচনা করেনি, সে সফরকারী হতে পারে না। অধিকাংশ আলেমের মতামত—সফরের সূচনা ব্যতীত পানাহার করা যাবে না।

সফরে রোজা পালনের উত্তম-অনুত্তম বিচারে শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্ববিদদের যাবতীয় বর্ণনা ও মতামতকে সামনে রেখেই আমরা বলতে পারি : সফরে রোজা পালন কিংবা ভঙ্গ করা—উভয়টিই রাসূলের আচরিত পথ। সফরের রোজা কিংবা পানাহারের বিষয়টি অযৌক্তিকভাবে যারা খারিজ করে দেন, তাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হতে হবে—সন্দেহ নেই।

চাঁদ দেখা কিংবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করার মাধ্যমে রোজা ভঙ্গকরণ

চাঁদ দেখার নিশ্চয়তা কিংবা পূর্ণ ত্রিশ দিন অতিক্রম ব্যতীত রাসূল রোজা ভঙ্গ করতেন না। হাদিসে এসেছে—

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها؛ فإن غمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.

তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, এবং তা দেখেই রোজা ভঙ্গ কর, এবং একে অভ্যাসে পরিণত কর। যদি তা মেঘে ঢেকে যায়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। দু ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে, সাক্ষ্য অনুসারে,

---

[1] সূরা বাকারা : ১৮৪।

রোজা রাখ, অথবা ভঙ্গ কর।[1] মাসের সূচনা-সমাপ্তির উভয়টিই—সৌর বাৎসরিক হিসেব নয়—প্রত্যক্ষণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ কাম্য।

এ ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোন বিরোধ এড়ানো মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য—সন্দেহ নেই ; এমনকি সম্মিলিতভাবে সকলে যদি গৌণ মতকে মেনে নেয় কিংবা সৌর বাৎসরিক হিসেবের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। যে মতবিরোধের ফলে ফরজ-ওয়াজিবের মত মৌলিক বিষয় লঙ্ঘিত হবে, মানুষ ব্যাপক ফেতনা ও ভ্রাতৃঘাতী পাপে আক্রান্ত হবে, ছড়াবে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ, তা এড়িয়ে, এ ধরনের সম্মিলিত গৌণ মতামত মেনে নেওয়াই উত্তম।

এভাবে, পারস্পরিক মতদ্বৈধতায় লিপ্ত হওয়া, সর্বৈবে, পাপ আজাবের উদ্রেককারী। সর্ব-মান্য বিজ্ঞ আলেম-সমাজের নেতৃত্ব, ও কিংবা কেন্দ্রীয় গ্রহণযোগ্য দিকনির্দেশনা ব্যতীত এ মতবিরোধ প্রকট রূপ ধারণ করে মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাগুলোয়। চাঁদ দেখা যাক কিংবা সৌর বাৎসরিক হিসাব মানা হোক, অসহনীয়ভাবে তারা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সহিষ্ণু ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ প্রদর্শন কাম্য।

উপরোক্ত বিষয়গুলো রাসূলের সে মহান আচরণীয় আদর্শের প্রতিফলন, যা তিনি উম্মতের নিকট পেশ করেছেন, এ আচরণ ও অভ্যাসের মাঝ দিয়েই তিনি আল্লাহর দরবারে রমজান মাসে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, রোজার সুন্নত, মোস্তাহাব ও আদব পালন করেছেন রহমতের আকুতি ও ব্যাকুলতা নিয়ে। নফল ও সুন্নতের

---

[1] নাসায়ি : ২১১৬। উক্ত হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ হয়, মাসের সূচনা-সমাপ্তির ক্ষেত্রেও মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে দু ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা। মুসনাদে (১৮৯১৫) ভিন্ন শব্দে হাদিসটি এভাবে এসেছে—وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا । কিন্তু, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে উমর রা.-এর একক সাক্ষ্যের মাধ্যমে রোজার সূচনা ঘোষণা দেন, আরেকবার কেবল একজন গ্রাম্য ব্যক্তির সাক্ষ্যের মাধ্যমেই সকলকে রোজার আদেশ প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন কোন সাক্ষীর তলব করেননি। এ কারণেই, কেউ কেউ মাসের সূচনা ও সমাপ্তির সাক্ষীর সংখ্যা তারতম্যের কথা বলেছেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

ব্যাপারে রাসূল যতটা যত্নবান ছিলেন, তার তুলনায় অনেক বেশি ছিলেন ফরজ ও ওয়াজিব আদায়ের ব্যাপারে, এবং হারাম ও পাপকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। এক হাদিসে কুদসীতে রাসূল এরশাদ করেন:—

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه.

বান্দার উপর আমি যা ফরজ করেছি, আমার নিকটবর্তীকারীর মাঝে তাই আমার সর্বাধিক প্রিয়।[1]

অপর এক হাদিসে রাসূল এরশাদ করেন :

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.

মিথ্যা কথন, সে অনুসারে আমল ও মূর্খতা প্রসূত আচরণ যে ব্যক্তি ত্যাগ না করবে, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে সওয়াব প্রদান করবেন না)।[2]

এ বিষয়টিই নাজাত আকাঙ্ক্ষী যে কোন মুসলমানকে নিজেকে জানবার, উপলব্ধি করবার এবং নিজ অবস্থানকে শনাক্ত করবার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় ; সম্পর্ক, যোগাযোগ, আচরণীয় ও নৈতিক—যাবতীয় ক্ষেত্রে নিজেকে সুন্দর-শোভাময় ও সৌকর্যমন্ডিত করে তুলতে উৎসাহ জোগায়। সে হয়ে উঠে রাসূলের অধিক নিকটবর্তী ও অনুবর্তী।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপলব্ধির পর আমরা বুঝতে পারব কতটা ঠুনকো বিষয় নিয়ে নব্য, আধুনিক সচেতন সমাজ নিজেদের কল্যাণব্রতী প্রমাণ করতে চাচ্ছে। যারা সুন্নত ও মোস্তাহাবকে কেন্দ্র করে ফরজ ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে হীনতর মনে করছে। লাভ

---

[1] বোখারি : ৬৫০২

[2] বোখারি : ৬০৫৭

অর্জনের পূর্বে মূলধন সংরক্ষণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ—সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ আপ্ত বাক্য সম্পর্কে জ্ঞাত। সুন্নত ও মোস্তাহাব পালন করার নিমিত্তে যদি ফরজ ও ওয়াজিব ত্যাগ করতে হয়, তবে তা হবে খুবই পরিতাপের ও পরিণতির বিচারে ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

রমজানে রাসূল সা.-এর এবাদতে রাত্রি জাগরণ

রাত্রি জাগরণ সালিহীন ও এবাদতগুজারদের নিদর্শন ও পরিচয় ; যারা দাওয়াত ও সংস্কারের মহান দায়িত্বে সতত নিয়োজিত ও মগ্ন, তাদের মহান আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তারা অনুসরণ-অনুবর্তন করেন সে মহান ব্যক্তিত্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, রাত্রি জাগরণ ছিল যার পুরো বছরের এবাদত—ওজর ব্যতীত তিনি কখনো রাত্রি জাগরণ ত্যাগ করতেন না, সুতরাং রমজানে কী পরিমাণ রাত্রি জাগরণ করতেন, তা বলাই বাহুল্য।

রাসূলের রাত্রি জাগরণ, তাহাজ্জুদ ও সালাত আদায়ের বৈশিষ্ট্য ও রূপ বর্ণনা করে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে—রাসূল রাতে এগারো কিংবা তেরো রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—রাসূল রমজান কিংবা অন্য সময়ে এগারো রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না।[1] অন্য এক হাদিসে আয়েশা রা. বর্ণনা করেন : রাসূল রাতে তেরো রাকাত সালাত আদায় করতেন। অত:পর ভোরের আজান শ্রুত হলে সংক্ষেপে দু রাকাত সালাত আদায় করতেন।[2]

তার রাত্রি জাগরণের পদ্ধতি ছিল নানা প্রকার, যেভাবেই করা হোক না কেন, এবাদতগুজার বান্দার জন্য তা হবে কল্যাণকর। তবে,

---

[1] বোখারি : ১১৪৭।

[2] বোখারি : ১১৬৪।

সুন্নত অনুসারে, উত্তম হচ্ছে জোড় হিসেবে দুই দুই রাকাত করে অধিক-হারে আদায় করা।

রাকাতের সংখ্যা ও পদ্ধতি বিষয়ে যত বর্ণনা রয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই, বিনয়-বিনম্রতার সাথে দীর্ঘ তেলাওয়াত, রাত্রি-জাগরণে ধ্যান-নিমজ্জন, অন্তরের সাক্ষ্য ও উপস্থিতি সহ জিকির ও দোয়া, প্রতিটি কর্মের সুষম সম্পাদন অধিক সংখ্যক রাকাতের তুলনায় উত্তম ও শ্রেয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যা ও পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ ব্যতীতই হাদিসে এরশাদ করেছেন—

صلاة الليل مثنى مثنى.

রাতের সালাত দুই দুই সংখ্যায়।[1]

তাত্ত্বিক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন, তারাবীহ নামাজের রাকাত-সংখ্যা বিষয়ে রয়েছে নানা মতবিরোধ ও এখতেলাফ।[2] রাসূলের সুন্নাহর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর আমরা

---

[1] বোখারি : ৯৯০।

[2] রমজানের কিয়ামুল লাইলের মাঝে রয়েছে তারাবীহের নামাজ যা জামাতে আদায় করা হয়। এটা স্বীকৃত সুন্নত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পালন করেছেন ; আবার কখনো কখনো ছেড়েছেন উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। অতঃপর এটা পুনর্জীবিত করেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব রা.।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, এক রাত্রিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামাজ পড়লেন, তার সাথে লোকজনও নামাজ পড়ল। পরের রাত্রিতে আবার নামাজ আদায় করলেন লোকজন পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেল। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাত্রিতেও লোকজন জমায়েত হলো কিন্তু রাসূল স. বের হলেন না। ভোরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه

তোমরা যা করেছ আমি দেখেছি। তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি বের হইনি। আর এ ঘটনা ঘটেছিল রমজান মাসে। (বোখারি ১২৯, মুসলিম ১৭৭)

আবু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমজানের রোজা পালন করেছি। তিনি আমাদেরকে নিয়ে কিয়ামুল লাইল করেননি (জামাত সহকারে)। অথচ মাসের আর মাত্র সাত দিন বাকি ছিল। অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে কিয়ামুল লাইল করলেন , রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। ষষ্ঠ রাত্রিতে কিয়ামুল করেননি। পঞ্চম রাত্রিতে আমাদের নিয়ে কিয়ামু ললাইল করেছেন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল যদি আমাদেরকে নিয়ে পুরো রাত্রি কিয়ামুল লাইলে কাটাতেন ? তিনি বললেন :

إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة. أبوداود، الترمذي ، النسائي ،ابن ماجـــة أحمد في المسند.

অর্থ : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (কিয়ামুল লাইল করবে) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের ছাওয়াব দান করা হবে। রাসূল আমাদের নিয়ে চতুর্থ রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করেননি। তৃতীয় রাতে তার পরিবার, স্ত্রী গণ, ও লোকজনকে জমা করলেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে সেহরির শেষ সময় পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল করলেন, এমনকি আমরা চিন্তিত ছিলাম সেহরি খেতে পারব কিনা ? অতঃপর মাসের বাকি রজনিগুলোতে আমাদের নিয়ে আর কিয়ামুল লাইল করেননি। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা, আহমদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাত সহকারে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ আদায় করেছেন পাঁচ কিংবা ছয় রজনি। রমজানের শুরুতে দুই বা তিন রজনি এবং শেষে তিন রজনি। দ্রঃ ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, তারাবীহ সংক্রান্ত আলোচনা।

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর সাথে রমজানের এক রজনিতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। লক্ষ্য করলাম মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে একাকী, আবার কেউ কয়েকজনকে নিয়ে নামাজ পড়ছে। ওমর রা. বললেন :

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل . (البخاري ٢٥٠/٤/ح٢٠١٠)

অর্থ : আমার মনে হচ্ছে সকলকে একজন কারীর (ইমাম) অধীনে জমায়েত করে দিলে তা হবে উৎকৃষ্টতর। অতঃপর সবাইকে উবাই বিন কাআব-এর সাথে জমায়েত করে দিলেন। অতঃপর অন্য এক রজনিতে আমি তার সাথে বের হলাম, লোকজন তাদের কারীর পেছনে নামাজ পড়ছিল, ওমর রা. বললেন : এই নতুন পদ্ধতি কতইনা চমৎকার। আর যারা শেষ রজনিতে কিয়ামুল লাইল করে তারা উত্তম প্রথম রজনিতে কিয়ামুল লাইলকারীদের তুলনায়। (বোখারি- ২০১০/২৫০/৪) মুসলামানদের কর্তব্য : রমজান জুড়ে কিয়ামুল লাইলের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া। এ ক্ষেত্রে তারা অন্তরে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সওয়াবের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ফলতঃ সে রাসূলের বর্ণিত পুরস্কারে নিজেকে ভূষিত করতে সক্ষম হবে। রাসূল রমজান আদায়ের মাধ্যমে পূর্বাপর যাবতীয় গোনাহ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারাবীহের নামাজ ইমামের সাথে আদায় করা, ইমাম নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত তার সাথে থাকা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। তাহলে সে পুরো রাত কিয়ামুল লাইল করার সওয়াব পাবে, যেমন আবু যর রা.-এর হাদিস জানা যায়।
তারাবীর নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কারো মত : ৪১ রাকাত, কারো মত : ৩৯ রাকাত, কারো মত : ২৩ রাকাত, কারো মত : ১৩ রাকাত, কারো মত : ১১ রাকাত। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا...(متفق عليه)

অর্থ—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান কিংবা অন্য কোন সময়ে এগারো রাকাতের অধিক (রাতে) আদায় করতেন না। (প্রথমে) তিনি চার রাকাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য হত অতুলনীয়। অত:পর চার রাকাত আদায় করতেন, তারও সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য হত অতুলনীয়। অত:পর আদায় করতেন তিন রাকাত...। (বোখারি ১১৪৭, মুসলিম ১২৫)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাত পড়েছেন তা বিশুদ্ধ বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদিস (বোখারি : ১২৫/২ ২১২/১, মুসলিম: ৫২৬, ৫২৫/১.) যায়েদ বিন খালেদের হাদিস (মুসলিম: ৫৩১/১.) থেকেও জানা যায়। ইমাম মালেক সহ অন্যান্য বিদ্বানগণ সায়িব বিন ইয়াযিদ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :—

أمر عمربن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام (الموطأ ١/١١٥/ح٤

অর্থ : ওমর বিন খাত্তাব উবাই বিন কাআব এবং তামীমুদ্দারীকে আদেশ করেছেন, তারা যেন লোকজনকে নিয়ে এগারো রাকাতে কিয়ামুল লাইল করেন। প্রতি রাকাতে কিরাত পড়তেন দুই শত আয়াতের মত, এতো দীর্ঘ কেয়াম করতেন যে আমরা লাঠিতে ভর করতাম। মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১১৫/১ সনদ বিশুদ্ধ।
সংখ্যায় যারা অল্প রাকাত আদায় করবে, তাদের জন্য লক্ষণীয় হল, তারাবীহে তারা দীর্ঘ কেরাত পড়বে। দ্র : ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া।
সায়িব বিন ইয়াযিদ হতে রমজান মাসে বিশ রাকাত পড়ার বর্ণনাও বিশুদ্ধ সনদে পাওয়া যায়। বাইহাকি ৪৯৬/২
তার বর্ণনা মতে বিশুদ্ধ সনদে আরো পাওয়া যায় যে, ওমর রা. উবাই বিন কাআব ও তামীমুদ্দারীর অধীনে লোকজনকে একুশ রাকাতে জামায়াত করেছিলেন। মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক ২৬০/২
ইয়াযিদ বিন রূমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকজন ওমর রা.-এর আমলে তেইশ রাকাতে কিয়ামুল লাইল করতেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেক:১১৫/১/হা:৫.

স্বীকার করতে বাধ্য হব—এ ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট কোন সীমা এঁকে দেননি। কেবল রাত্রি-জাগরণের ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত

ইয়াযিদ বিন রূমান 'মুনকাতে', কারণ তিনি ওমর রা.-কে পাননি। তবে তার এ বর্ণনার পক্ষে পূর্বের বর্ণনা থেকে সমর্থন পাওয়া যায়। এবিষয় আরো বর্ণনা আছে, এসব প্রমাণ করে যে ওমর রা.-এর যুগে বিশ রাকাতের প্রচলন ছিল। ঐ ব্যক্তি এর বিরোধী, যে মনে করে এই বর্ণনা দুর্বল এবং ১১ রাকাতের বেশি কিয়ামুল লাইল করা যাবে না। বিস্তারিত দেখুন : আল্লামা আলবানী রহ. সালাতুত তারাবীহ এবং ইসমাইল আল আনসারী প্রমুখের জবাব।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ র. উল্লেখ করেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামে রমজানের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করেননি। অতঃপর সালাফে সালেহীন হতে বর্ণিত কিয়ামুল লাইলের রাকাত সংখ্যাগুলো উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন :—

وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. الفتاوي٢٢/٣٧٢

অর্থ : এ সবই চলে। যে কোন একটি অনুকরণ করে কিয়ামুল লাইল করলে সে উত্তম কাজ করল। এবং বলেন : এগুলো হতে কোনটিই অপছন্দ করা যাবে না। ইমাম আহমদ প্রমুখ হতে এরূপ বিবরণ রয়েছে। তিনি আরো বলেন :—

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه سلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. الفتاوي ٢٢/٢٧٢

যে মনে করে, কিয়ামে রমজানে নির্দিষ্ট সংখ্যার বিবরণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত এবং তাতে তারতম্য করা যাবে না, সে অবশ্যই ভুল করেছে। (ফতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৭২/২২)

ফাতাওয়ায়ে আল-লাজনা আদ-দায়েমা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

فلم يحدد صلاة الله و سلامه عليه ركعات محدودة و لأن عمر رضي الله عنه و الصحابة رضي الله عنهم صلوها في بعض الليالي عشرين سوى الوتر و هم أعلم الناس بالسنة.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তারাবীহের ক্ষেত্রে) নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করেননি। এবং উমর রা. এবং অন্যান্য সাহাবি বৃন্দ কোন কোন রাত্রিতে বিতির ব্যতীতই বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। সুন্নত সম্পর্কে সকলের তুলনায় তারাই অধিক জ্ঞাত। ফাতাওয়ায়ে আল-লাজনা আদ-দায়েমা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯৮।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে গিয়ে ১১ অথবা ১৩ রাকাত নামাজ পড়ল, সে ভালো করেছে এবং নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। আর যে, তেইশ রাকাত পড়ল ওমর রা.-এর আমলে মুসলমানদের অনুকরণ করে, সেও ভালো করেছে। তবে মুক্তাদীর উচিত ইমাম যত রাকাতই পড়ুক, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সাথে থাকা, যাতে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের ছাওয়াব অর্জন করতে পারে।

করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলের নীরবতা অবলম্বন বিষয়টির ব্যাপক সম্ভাব্যতার প্রমাণ করে—সুতরাং, ব্যক্তির পক্ষে একাগ্রতা-বিনম্র চিত্ততা ও প্রশান্তির সাথে যতটা সম্ভব সালাত আদায় বৈধ, যদিও সংখ্যা ও পদ্ধতিগত দিক থেকে রাসূলকে অনুসরণ করা শ্রেয়।[1]

রাসূল কখনো পূর্ণ রাত্রি সালাতে জাগরণ করতেন না। কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু সময় কাটাতেন। আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه و سلم قرأ القـــرآن كـــله في ليـــلة، ولا قام ليلة حتى أصـــبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان.

রমজান ব্যতীত কোন রাত্রিতে আমি রাসূলকে পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোজা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখিনি।[2]

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত : জিবরাইল আ. রমজানের প্রতি রাতে ভোর অবধি রাসূলের সাথে কাটাতেন। রাসূল তাকে কোরআন শোনাতেন।[3]—রাসূল যদি সে রাতগুলোতে পূর্ণ সময় ব্যয়ে কিয়ামুল লাইল করে কাটিয়ে দিতেন, তবে জিবরাইল আ.-এর সাথে কোরআন অনুশীলনে সময় পেতেন না।

এবাদতের এ পদ্ধতি শরীরের জন্য অনুকূল, মন এতে অংশ নেয় স্বত:স্ফূর্তভাবে। এর ফলে ব্যক্তির জন্য পরিবারের হক আদায় সম্ভব হয় ; এবাদতে অব্যহততা আনা যায়, সহনীয়ভাবে, ক্রমশ: দ্বীনের মাঝে প্রবেশ সহজ হয়। নফ্স হঠাৎ বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে না। অধিক কিন্তু

---

[1] বিষয়টি বিস্তারিতে জানার জন্য দ্রষ্টব্য : আতিয়া মোহাম্মদ সালেম রচিত مع الرسول في رمضان

[2] আহমদ : ২৪২৬। সহিহাইনের শর্ত মোতাবেক তার সূত্রটি শুদ্ধ।

[3] বোখারি : ১৯০২।

বিচ্ছিন্ন এবাদতের তুলনায় পরিমাণে স্বল্প ও অব্যাহত এবাদত কল্যাণকর ও আল্লাহর নিকট প্রিয়।

অধিকাংশ সময় রাসূল—উম্মতের জন্য ফরজ করে দেয়া হবে এ আশঙ্কায়—রাতে একাকী সালাত আদায় করতেন। আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضاً، حتى كنا رهطاً، فلما حسَّ النبي صلى الله عليه و سلم أنَّا خلْفه جعل يَتَجوَّز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟، قال: فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت.

রাসূল রমজানে (রাতে) সালাত আদায় করতেন। একদিন আমি এসে তার পাশে দাঁড়ালাম, অত:পর এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল—এভাবে কিছুক্ষণের মাঝে আমরা একটি দলে পরিণত হলাম। রাসূল যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা তার পিছনে দাঁড়ানো, তখন সংক্ষেপে সালাত আদায় করতে লাগলেন। অত:পর তিনি তার গৃহে প্রবেশ করে একাকী সালাত আদায় করলেন। প্রত্যুষে আমরা তাকে বললাম : আপনি রাতে আমাদের সাথে কৌশল করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যা। আমি তোমরা জড়ো হওয়ার ফলেই আমাকে কৌশল করতে হয়েছে।[1]

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

أن رسول الله صلي الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته؛ فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلي الله عليه و سلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته؛ فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا

[1] মুসলিম : ১১০৪।

بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه و سلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهد فقال: أما بعد: فإنه لم يَخْفَ علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.

এক রাতে রাসূল গৃহ হতে বেরিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। কয়েক ব্যক্তি তার সাথে সালাত আদায় করল। পরদিন সকলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল, ফলে পূর্বের তুলনায় অধিক লোক সমাগম হল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও রাসূল আগমন করলে লোকেরা তার সাথে সালাত আদায় করল, সকলে এ নিয়ে আলোচনায় অংশ নিল। তৃতীয় রাত্রিতে পূর্বেরও অধিক লোকসমাগম হল। রাসূল বের হলে সকলে তার সাথে সালাত আদায় করল। চতুর্থ রাত্রিতে এত মুসল্লি হল যে, মসজিদ তাদের ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ল। কয়েক ব্যক্তি ডেকে বলল : সালাত ! কিন্তু, রাসূল ফজরে সালাতের পূর্বে বেরুলেন না। ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি সকলের দিকে ফিরে তাশাহুদ পাঠ করে বললেন : গত রাতের ঘটনা আমার অবিদিত নয়। কিন্তু, আমি আশঙ্কা করেছি যে, তোমাদের উপর রাতের সালাত ফরজ করা হবে, তোমরা তা আদায়ে অপরাগ হয়ে পড়বে।[1]

আবু যর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে রোজা পালন করেছি, যখন মাসের মাত্র সাতদিন বাকি ছিল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করলেন। ষষ্ঠ দিনে তিনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করেননি। পঞ্চম রাতে অর্ধ রাত্রি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে আরজ করলাম : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি বাকি সময়টুকুও যদি আমাদের নিয়ে নফল সালাতে কাটাতেন ! তিনি বললেন : যে

[1] বোখারি : ১১২৯। মুসলিম : ৭৬১।

ব্যক্তি ইমাম সালাত সমাপ্তি করা অবধি তার সাথে সালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায়ের সওয়াব লিখে দেয়া হবে। অত:পর তিনি শেষ তিন রাত বাকি থাকা পর্যন্ত আর আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনদের ডেকে নিলেন। এতটা সময় তিনি আমাদের সাথে রাত্রি জাগরণ করেছিলেন যে সেহরির সময় অতিক্রান্তের ভয় হচ্ছিল।[1]

রাসূল—তার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক—উম্মতের কল্যাণ, শিক্ষা ও এবাদতে সহায়তা দানে ছিলেন বদ্ধপরিকর, অত্যন্ত আগ্রহী। কতটা সময় তিনি উম্মতকে সাথে নিয়ে রাত্রি জাগরণ-সালাত আদায় করেছেন—বলাই বাহুল্য।

আগ্রহের সাথে সাথে তিনি এ আশঙ্কাও পোষণ করতেন যে, তার উম্মতের উপর রাত্রি-জাগরণ ও সালাত আদায় ফরজ করা হতে পারে; ফলে কিছু লোক এ ব্যাপারে অক্ষমতায় আক্রান্ত হবে, গোনাহর ভাগীদার হবে ফরজ ত্যাগের ফলে। সাহাবিদের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার কারণে তিনি তাদের সাথে রাতে সালাত আদায় করতেন, অন্যথায়, পরবর্তী দুর্বল মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি এ ব্যাপারে তাদের বারণ করেছিলেন।

আল্লাহ তার প্রিয় রাসূলের মহত্ত্ব, দয়ার্দ্রতা এবং আবেগের যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন ; কোরআনে এসেছে—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

অবশ্যই তোমাদের মাঝে, তোমাদের থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন, যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তা তার জন্য

[1] তিরিমিজি : ৮০৬, হাদিসটি সহি।

কষ্টদায়ক, সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমিনদের জন্য দয়ার্দ্র, ও করুণাময়।[1]

যারা দায়ি, সংস্কার কর্মে নিয়োজিত, তাদের জন্য বিষয়টি গাইড ও আদর্শ স্বরূপ। মানুষের হেদায়েত ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য শ্রম ব্যয় করে নিজেকে তারা উজাড় করে দেবে, উম্মতের জন্য অন্তরে লালন করবে সহানুভূতি, করুণা ও হৃদ্যতা। তাদের অস্বীকৃতি ও বিকারকে এড়িয়ে দ্বীনকে তুলে ধরবে সরল নীতিমালা হিসেবে।

উল্লেখিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে আমরা তারাবীহ নামাজের ফজিলত বিষয়ে অবগতি লাভ করি, প্রথমে তা ছিল রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত-প্রবর্তিত মসজিদে আদায়কৃত সুন্নত ; পরবর্তীতে ফরজ করে দেয়ার আশঙ্কায় রাসূল তা পরিত্যাগ করেন। উমর ফারুক রা.-এর খেলাফতকালে—রাসূলের তিরোধানের ফলে ফরজ হওয়ার সম্ভাবনা যখন লুপ্ত—তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা বিচ্ছিন্নভাবে মসজিদে তারাবীহ-র সালাত আদায় করছে, সকলকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন :—

إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيٍّ بن كعب رضي الله عنه.

আমার মনে হয়, সকলে যদি এক ইমামের পিছনে তা আদায় করত, তবে তা হত সুন্দর-উত্তম। অত:পর তিনি গুরুত্বের সাথে সকলকে উবাই বিন কাব-এর ইমামতিতে একত্রিত করলেন।[2]

উমরের এ আদেশ সাহাবিদের সকলে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন—এমনকি, একদা রমজানের প্রথম রাত্রিতে আলী রা. মসজিদে এসে দেখতে পেলেন, তাতে আলো জ্বলছে, সকলে সমস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করছে, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উমর রা.-

---

[1] সূরা তওবা : আয়াত, ১২৮।

[2] বোখারি : ১৯০৬।

কে লক্ষ্য করে বললেন : হে উমর বিন খাত্তাব ! আল্লাহ আপনার কবরকে আলোয় আলোকিত করুন, যেভাবে আপনি মসজিদকে কোরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন।[1]

সুতরাং, যে ব্যক্তি তা পালন করতে আগ্রহী, এবং এ ব্যাপারে রাসূল ও তার সাহাবাগণের অনুবর্তী, তার দায়িত্ব যত্নের সাথে তা পালন করা। হাদিসে আছে—একবার রাসূল যখন কয়েকজনকে নিয়ে রাত্রি যাপন করছিলেন, অর্ধ রাত্রি অতিক্রান্তের পর জনৈক সাহাবি তাকে বলল : আপনি যদি বাকি রাতটুকু আমাদের নিয়ে নফল আদায় করতেন ! তখন রাসূল বললেন : ইমামের সাথে যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করল, এবং ইমাম সমাপ্ত করা অবধি সে প্রস্থান করল না, তাকে পূর্ণ রাত্রি এবাদতে যাপনের সওয়াব প্রদান করা হবে।[2] রাসূলের এ উক্তি প্রমাণ করে, ইমামের সাথে রমজানের রাত্রি এবাদতে যাপন খুবই ফজিলতপূর্ণ একটি কর্ম।

তারাবীহ সালাতের রাকাতের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের সীমা-রোপ, এবং ইমামের সালাত সমাপ্তির পূর্বেই প্রস্থান—হাদিসটি প্রমাণ করে—বৈধ হলেও, উত্তম ও প্রশংসনীয় হতে পারে না কোনভাবে। যারা এভাবে বিষয়টির ইজতিহাদ করেছেন, আমি মনে করি, তাদের ইজতিহাদ প্রশংসনীয়, কিন্তু পূর্ণ এক রাত্রির সওয়াব বিনষ্টকারী, বিধায় কর্মের বিচারে প্রশংসনীয় নয়।

রাসূলের রাত্রিকালীন সালাতের দৈর্ঘ্য

রমজানে রাত্রিকালীন সালাতের ক্ষেত্রে রাসূল সালাতকে অনেক দীর্ঘ করতেন। উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা.-কে রমজানে রাসূলের সালাত বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন :—

---

[1] ইবনে আবিদ্দুনয়া : ফাজায়েলুল কোরআন : ৩০।

[2] নাসায়ি : ৩৬৪।

ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟، قال: يا عائشة، إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي.

রমজান কিংবা অন্য সময়ে তিনি (রাতে) এগারো রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য হত অতুলনীয় ; অত:পর চার রাকাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যও হত অতুলনীয়। এর পর তিন রাকাত আদায় করতেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি বিতির আদায়ের পূর্বেই ঘুমাবেন ? তিনি বললেন, হে আয়েশা ! আমার দু-চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।[1]

নোমান বিন বশির বর্ণনা করেন, আমরা রমজানের তেইশতম রাত্রির প্রথম এক তৃতীয়াংশ রাসূলের সাথে যাপন করলাম। পঁচিশতম রাত্রিতে অর্ধরাত্রি আমরা তার সাথে কাটালাম। সাতাশতম রাত্রিতে এতটা সময় যাপন করলাম যে, আমাদের আশঙ্কা হল, সেহরি গ্রহণ করতে পারব না।[2]

রাসূলের সাহাবিগণ দীর্ঘ সময় রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে ছিলেন তার উত্তম অনুসারী। সায়েব বিন য়াযিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর বিন খাত্তাব উবাই বিন কাব ও তামিম দারিকে নির্দেশ দিলেন সকলকে নিয়ে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতে। তিনি বলেন : ইমাম এতটা সময় তেলাওয়াত করতেন যে, আমরা দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার ফলে লাঠিতে ভর দিতাম। ফজর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে আমরা প্রস্থান করতাম না।[3] তার থেকে আরো বর্ণিত আছে : দীর্ঘ

---

[1] বোখারি : ২০১৩।

[2] নাসায়ি : ১৬১৬, হাদিসটি সহি।

[3] মুয়াত্তা মালেক : ২৫০।

সময় দণ্ডায়মানের ফলে উসমান বিন আফ্ফান এর কালে লোকেরা লাঠিতে ভর দিত।[1]

যারা সংক্ষেপ তেলাওয়াতের মাধ্যমে তারাবীহ সালাতকে সংক্ষিপ্ত করেন, হাদিসগুলো তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ। এতটাই দ্রুততার সাথে তারা সালাত আদায় করেন যে, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা হয় না, সালাতের রুকন ও ওয়াজিবগুলো পালন করা হয় না পূর্ণাঙ্গরূপে। মোস্তাহাব ও ধৈর্য-প্রশান্তির বিষয়ের উল্লেখ বাহুল্য বৈ নয়।

অপরদিকে, কেবল সংখ্যার ক্ষেত্রেই যারা রাসূলকে অনুসরণ করেন, পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাদের অশুদ্ধতাও চিহ্নিত। রাসূল দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতেন, বিনয়-বিনম্রতার চূড়ান্ত করে নিজেকে আল্লাহর দরবারে পেশ করতেন। নামাজরত রাসূল ছিলেন প্রশান্তি ও ধৈর্যের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে কল্যাণের দিশা ও সঠিক পথ-প্রাপ্তির তৌফিক কামনা করি।

তবে ইমামের দায়িত্ব তার জামাতের সাথে বৈধ সীমারেখা পর্যন্ত সমঝোতা করে সালাত পরিচালনা করা। দীর্ঘ সময় যদি তাদের নিয়ে সালাত আদায় সম্ভব না হয়, তবে যতটা সম্ভব সহনীয় পর্যায়ে দীর্ঘায়িত করবে। রাসূল বলেছেন :—

إذا قام أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.

যখন তোমাদের কেউ ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে, কারণ, তাদের কেউ দুর্বল, অসুস্থ কিংবা বৃদ্ধ। তবে, যখন একাকী পড়বে, ইচ্ছা অনুসারে সালাত দীর্ঘ করবে।[2]

[1] সুনানে কুবরা : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৬।

[2] বোখারি : ৭০৩।

এতেকাফে আল্লাহর একান্ত-সান্নিধ্য যাপন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে এতেকাফ পালন করতেন, একান্ত কিছু সময় যাপন করতেন আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে। রাসূলের এতেকাফকালীন সময় বিচার করলে এ ব্যাপারে তার আচরণ, সুন্নত ও অবস্থা স্পষ্টরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হবে।

প্রতি বছর রাসূল মদিনায় এতেকাফ পালন করতেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন: রাসূল প্রতি রমজানে এতেকাফ পালন করতেন।[1]

রাসূল মাসের প্রতি দশে এতেকাফ করেছেন, অত:পর লাইলাতুল কদর শেষ দশ দিনে জেনে তাতে স্থির হয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে—

রাসূল বলেন :—

إني اعتكفت العشر الأُوَل ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أُتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف؛ فاعتكف الناس معه.

আমি কদরের রাত্রির সন্ধানে প্রথম দশ দিন এতেকাফ করলাম। এরপর এতেকাফ করলাম মধ্যবর্তী দশদিনে। অত:পর ওহি প্রেরণ করে আমাকে জানান হল যে তা শেষ দশ দিনে। সুতরাং তোমাদের যে এতেকাফ পছন্দ করবে, সে যেন এতেকাফ করে। ফলে, মানুষ তার সাথে এতেকাফ যাপন করল।[2]

---

[1] বোখারি : ২০৪১।

[2] মুসলিম : ১১৬৭।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু-পূর্ব পর্যন্ত রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ পালন করেছেন।[1]

এতেকাফকালীন রাসূল মসজিদে সকলের থেকে আলাদা করে একটি তাঁবু-সদৃশ টানিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতেন। সকল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাতে তিনি আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য যাপন করতেন। অন্ত রের যাবতীয় একাগ্রতা ও মনোযোগ, আল্লাহর জিকির, বিনয়-বিনম্রতার সাথে নিজেকে তার দরবারে সমর্পণ যেন হয় অন্তরের একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান—এ উদ্দেশ্যেই রাসূল নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত সময় যাপন করতেন।

আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল এক তুর্কি তাঁবুতে এতেকাফে বসলেন, যার প্রবেশমুখে ছিল একটি চাটাইয়ের টুকরো। তিনি বলেন : রাসূল সে চাটাইটি হাতে ধরে একপাশে সরিয়ে রাখলেন এবং মুখমণ্ডল বের করে মানুষের সাথে কথোপকথনে নিয়োজিত হলেন।[2]

নাফে বিন উমর হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতেন। নাফে বলেন: আব্দুল্লাহ রা. মসজিদের যে অংশে রাসূল এতেকাফ করতেন, তা আমাকে দেখিয়েছেন।[3]

ইবনে কায়্যিম বলেন : এসব আয়োজন এতেকাফের উদ্দেশ্য ও রুহ লাভের জন্য। মূর্খরা যেমন করে জনবহুলভাবে, জাঁকজমকের সাথে এতেকাফ করে, তা সিদ্ধ নয় কোনভাবে।[4]

---

[1] বোখারি : ২০২৬।

[2] ইবনে মাজা : ১৭৭৫।

[3] মুসলিম : ১১৭১।

[4] যাদুল মাআদ : ইবনে কায়্যিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০।

বিশ তারিখের দিবসের সূর্যাস্তের পর একুশ তারিখের রাতের সূচনাতে রাসূল তার এতেকাফগাহে প্রবেশ করতেন, এবং তা হতে বের হতেন ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর। মধ্যবর্তী এই সময়টি শেষ দশদিন, যাতে এতেকাফের বিধান দেয়া হয়েছে। আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের মধ্যবর্তী দশ দিনে সম্মিলিতভাবে এতেকাফ পালন করতেন। বিশতম রাত্রি বিগত হয়ে একুশতম দিবস উদিত হলে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন, এবং যারা তার সাথে এতেকাফ যাপন করত, তারাও ফিরে আসত, সম্মিলিতভাবে যাপিত রাত্রিগুলোর যে রাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন, একবার সে রাত্রি যাপন করলেন সকলকে নিয়ে, সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তাদের নির্দেশ দিলেন আল্লাহ তাআলার আদেশ বিষয়ে। অত:পর বললেন : আমি ইতিপূর্বে এই দশে সম্মিলিতভাবে এতেকাফ পালন করতাম। এখন আমাকে জানানো হয়েছে যে, শেষ দশ রাত্রিতে সম্মিলিতভাবে যাপন করা কাম্য, সুতরাং যে আমার সাথে এতেকাফ করবে, সে যেন এতেকাফস্থলে অবস্থান করে। আমাকে এ (লাইলাতুল কদর) দেখানো হয়েছিল, অত:পর আমি তা বিস্মৃত হয়েছি। তোমরা তা শেষ দশ দিনে অনুসন্ধান কর, এবং অনুসন্ধান কর প্রতি বেজোড়ে। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি পানি ও কাদায় সেজদা দিচ্ছি। একুশের রাতে আকাশ ঝেপে বৃষ্টি এল, এবং রাসূলের জায়নামাজে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি পড়ল।[1] হাদিসটি প্রমাণ করে, একুশের রাত্রি হতেই এতেকাফের সূচনা, এবং এতেকাফ দিবসগুলোর শেষ দিবসের সূর্যাস্তের পরই কেবল এতেকাফকারী আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

এস্থলে উল্লেখ্য যে, আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে আমরা দেখতে পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর বাদে এতেকাফস্থালে প্রবেশ করতেন। তার বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

---

[1] বোখারি : ১৯১৪।

كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এতেকাফের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন ফজর আদায় করে এতেকাফগাহে প্রবেশ করতেন।[1]—এতে উভয় বর্ণনার মাঝে সংঘর্ষ হবে না। কারণ, বোখারির ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে একই হাদিস কিছু শাব্দিক তারতম্য সহ বর্ণিত হয়েছে, এবং তাতে আছে—دخل مكانه الذي اعتكف فيه অর্থাৎ, তিনি প্রবেশ করলেন এমন স্থানে যাতে তিনি ইতিপূর্বে এতেকাফ করেছেন।[2] পূর্বের রাতে—একুশের রাতে—এখানে এতেকাফ করে রাসূল কোন কারণে হয়ত বেরিয়েছিলেন, এবং ফজর বাদ তাতে আবার প্রবেশ করেছেন। ইবনে উসাইমিন বলেন : এ বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, রাসূল তাতে প্রবেশের পূর্বে অবস্থান করেছেন। কারণ, হাদিসে বর্ণিত اعتكف অতীতকালীন ক্রিয়া, যার মানে হল তিনি ইতিপূর্বে তাতে এতেকাফ করেছেন। এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে শব্দকে তার মৌলিক অর্থে রাখাই কাম্য।

উক্ত বর্ণনার আলোকে, এতেকাফে আগ্রহী ব্যক্তি বিশ তারিখ দিবসের সূর্যাস্তের পর এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে এবং ত্রিশ পূর্ণ হওয়া কিংবা দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে মাস শেষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর উক্ত এতেকাফগাহ হতে প্রস্থান করবে। এখানেই এতেকাফের কালের সমাপ্তি। এতেকাফের কাল রমজানেই সীমাবদ্ধ, অন্য কোন মাসে নয়।

তবে, সালফে সালিহীনের কেউ কেউ ঈদের জামাতে বের হওয়া অবধি মসজিদে অবস্থান করেছেন।[3]

---

[1] মুসলিম : ১১৭৩।

[2] বোখারি : ১৯৩৬।

[3] মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৮৪।

এতেকাফরত অবস্থাতেও রাসূল পাক-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন, যেমন বর্ণিত হয়েছে উরওয়ার হাদিসে। তিনি বলেন : আয়েশা রা. আমাকে বলেছেন—হায়েজা অবস্থায় তিনি রাসূলের কেশবিন্যাস করে দিতেন। রাসূল তখন মসজিদে অবস্থান করতেন, গৃহে অবস্থানরতা আয়েশার নিকট তিনি মস্তক এগিয়ে দিতেন, এবং তিনি হায়েজা অবস্থাতেই তার কেশ বিন্যাস করে দিতেন।[1]

ইবনে হাজার বলেন : হাদিসটি প্রমাণ করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল, ক্ষৌরকর্ম, কেশ বিন্যাস বৈধ। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, এতেকাফকালীন কেবল সেসব বিষয় মাকরূহ, যা মাকরূহ সচরাচর মসজিদে।[2]

এতেকাফকালীন রাসূল কোন অসুস্থ ব্যক্তির দর্শনে যেতেন না, অংশ নিতেন না কোন জানাজায়, বর্জন করতেন স্ত্রী সংস্পর্শ বা সহবাস। আয়েশা রা. বলেন : এতেকাফকারীর সুন্নত হচ্ছে অসুস্থের দর্শনে গমন না করা, জানাজায় অংশ না নেয়া, নারী সংসর্গ ও সহবাস বর্জন করা এবং অত্যবশ্যকীয় কোন প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফ হতে বের না হওয়া।[3]

এতেকাফরত অবস্থায় রাসূলের স্ত্রী-গণ তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কথোপকথন করতেন তার সাথে। সাফিয়া রা. বলেন : রাসূল এতেকাফরত অবস্থায় আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলাম, তার সাথে আলাপ করে অত:পর চলে এলাম...।[4] অপর রেওয়ায়েতে আছে—একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে

---

[1] বোখারি : ২৯৬।

[2] ফাতহুল বারি : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ৩২০।

[3] আবু দাউদ : ২৪৭৩।

[4] বোখারি : ৩০৩৯।

অবস্থানকালীন তার স্ত্রী-গণ তার পাশে ছিলেন, তারা ছিলেন আনন্দিত.... ।[1]

হাদিসগুলো প্রমাণ করে, এতেকাফরত অবস্থাতেও রাসূল স্ত্রী-গণের সংবাদ নিয়েছেন। এতেকাফের ফলে যে মূর্খরা তাদের পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে যায়, তারা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আমার বোধগম্য নয় যে, আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও তারা কীভাবে এ আচরণ করতে দু:সাহস দেখায়। আল্লাহ বলেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. [الأنفال: ٢٧]

হে মোমিনগণ ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, তোমাদের পরস্পরের আমানতের খেয়ানতও করবে না।[2]

—এবং হাদিসে এসেছে—রাসূল বলেছেন :—

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.

মানুষের জন্য পাপ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার ভোরণ-পোষণ তার দায়িত্ব তাকে বিনষ্ট করে দেয়।[3]

পরিবারের সাথে এ জাতীয় আচরণ, সন্দেহ নেই, হারাম। এর পাপ এতেকাফের সওয়াব অপেক্ষা বড়। কারণ, এর ফলে ওয়াজিবকে পরিত্যাগ করে মোস্তাহাবের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। উমরা, এতেকাফ ও এ জাতীয় অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে একই হুকুম।

ওয়াজিব ছুঁড়ে ফেলে মোস্তাহাব আমল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে যখন এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে, তখন সহজে অনুমেয় যে, পার্থিব ক্ষুদ্র উপার্জনের সন্ধানে যে ভুলে যায় পরিবার-পরিজনের কথা,

---

[1] বোখারি : ১৮৯৭।

[2] সূরা আনফাল : আয়াত : ২৭।

[3] আহমদ : ৬৪৯৫।

আল্লাহ তাকে কী পরিমাণ শাস্তি দিবেন, পরকালে তার কী পরিণতি হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যবশ্যকীয় কোন কারণ ব্যতীত এতেকাফগাহ হতে বের হতেন না। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল এতেকাফরত অবস্থায় কোন কারণ ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করতেন না।[1] সাফিয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফরত অবস্থায় এক রাতে আমি তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। আমি তার সাথে আলোচনা সেরে উঠে চলে এলাম। আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি এলেন। সাফিয়ার আবাস ছিল উসামা বিন যায়েদের বাড়িতে।[2]

প্রবল কোন কারণ বশত: কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পবিত্র দেহের কিছু অংশ এতেকাফগাহ হতে বের করতেন। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এতেকাফরত অবস্থায় রাসূল মসজিদ হতে তার মস্তক বের করতেন, আর আমি হায়েজা অবস্থাতেই তা ধৌত করে দিতাম।[3]

রাসূল একবার তার স্ত্রী-গণকে উত্তম পথ প্রদর্শন, মনোরঞ্জন ও আনন্দ প্রদানের জন্য রমজানের এতেকাফ ত্যাগ করেছেন—তবে, একই বছরের শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিনে উক্ত এতেকাফের কাজা আদায় করে নিয়েছেন।

উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এতেকাফে মনস্থ হলেন, ফজরের সালাত আদায় করে এতেকাফগাহে প্রবেশ করলেন। রাসূল তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ, তিনি রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করার মনস্থ করেছিলেন। জয়নবকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেটিও

---

[1] বোখারি : ২০২৯।

[2] বোখারি : ৩২৮১।

[3] বোখারি : ১৮৯০।

টানানো হয়েছিল, তিনি ছাড়া অন্যান্যদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ফলে তাদেরগুলো টানানো হয়েছিল। ফজরের সালাত শেষে রাসূল অনেকগুলো তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : তোমরা কি এর মাধ্যমে পুণ্য অর্জনের ইচ্ছা করছ ? রাসূল অত:পর নির্দেশ দিলে তার তাঁবু গুটিয়ে নেয়া হল, এবং তিনি রমজানে এতেকাফ পরিত্যাগ করলেন এবং শাওয়ালের প্রথম দশদিন এতেকাফের কাজা আদায় করলেন।[1]

রাসূল, এভাবে, দুটি ভাল কাজ একই সাথে সমাধা করেছেন— এক দিকে এতেকাফ পালন করেছেন, অপরদিকে স্ত্রী-গণের মানসিকতার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ দৃষ্টি রেখেছেন, তাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, অযাচিত কোন কারণ বশতঃ এবাদত বন্দেগির মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি সর্বার্থে অনুচিত।[2]

কোন কারণ বশত যদি এতেকাফ ছুটে যেত, তবে রাসূল পরবর্তীতে তা কাজা করে নিতেন—পূর্বের হাদিসে যেমন উল্লেখ হয়েছে যে, স্ত্রী-গণের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি এতেকাফ বর্জন করেছিলেন, পরবর্তীতে, শাওয়ালের প্রথম দশ দিনে তা কাজা করে নিয়েছেন। একবার সফরে থাকার কারণে এতেকাফ পালন সম্ভব না হলে রাসূল পরবর্তী বছরে বিশ দিন এতেকাফ করে তা কাজা করে নিয়েছিলেন। আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশদিনে এতেকাফ পালন করতেন। এক বছর তিনি এতেকাফ পালনে সক্ষম হলেন না, তাই, পরবর্তী বছরে তিনি বিশ দিন এতেকাফ করে নিয়েছিলেন।[3]

উবাই বিন কাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ পালন করতেন, একবার সফর জনিত কারণে

---

[1] ইবনে হিব্বান : ৩৬৬৩।

[2] দ্র : আল্লামা আইনি, উমদাতুল ক্বারি : খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[3] তিরমিজি : ৮০৩, হাদিসটি সহি।

তিনি এতেকাফ করলেন না, পরবর্তী বছরে, তাই, দশ দিন এতেকাফ করে নিলেন।[1]

এতেকাফের কারণে রাসূল সফর বাদ দেননি, সফর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন ও কল্যাণ হতেও পিছপা হননি, এবং ভুলে যাননি এতেকাফের কথা, পরবর্তী বছরে তাই, তাৎক্ষণিক এতেকাফ সহ কাজা এতেকাফও আদায় করে নিয়েছিলেন। বর্তমান আলেম সমাজ, সংস্কারক ও দায়িদের আমরা দেখতে পাই যে, সাময়িক যৌক্তিক কোন কারণ বশত: হয়তো তারা নির্দিষ্ট কোন এবাদত মওকুফ করতে বাধ্য হন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সাথে সমন্বয় সাধন করে তা পালন করতে পারেন না বিধায় তাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু, রাসূলের প্রদর্শিত হেদায়েত অনুসারে পরবর্তীতে তা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন না।

এতেকাফ পরিত্যাগের প্রবণতা বর্তমানে খুবই ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইমাম যুহরি বলেন : অবাক ব্যাপার ! মুসলমানগণ এতেকাফ পরিত্যাগ করছে হর-হামেশা, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন পরবর্তীতে মৃত্যু অবধি এতেকাফ পরিত্যাগ করেননি।[2]

উম্মতের মহান দায়িত্ব সত্ত্বেও, রাসূলের এতেকাফ, মসজিদে স্থাপিত তাঁবুতে একাকিত্ব যাপন, মাওলার এবাদত ও জিকিরে আত্মা ও মনন সমর্পণ ইঙ্গিত করে—যে কোন কালের দায়ি, সংস্কারক ও আলেম মাত্ররই কর্তব্য ও দায়িত্ব নিজের জন্য একাকী-নির্বিঘ্ন কিছু সময় নির্ধারণ করা, যাতে আত্মিক অনুসন্ধান ও নফ্‌সের মোহাসাবায় নিরত হবে।

এ ব্যাপারে উদাসীনতা, গাফিলতি ও ভ্রূক্ষেপ-হীনতা নফ্‌সের ক্লেদাক্ততা ও অসুস্থতা কেবল বৃদ্ধিই করে ; এক সময় বাসা বাধে মানুষের অনুভূতি ও চিন্তার গোপনতম এলাকায়, কুড়ে কুড়ে নষ্ট করে

---

[1] ইবনে হিব্বান : ৩৬৬৩। তার বর্ণিত সূত্র ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে।

[2] ইবনে হাজার : ফাতহুল বারি : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৪।

দেয় ঈমান ও বিশ্বাসের বিনির্মাণগুলো। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আল্লাহ পাকের সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা পরিত্যাগ লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, বান্দা সহজে হারিয়ে ফেলে নিজেকে পাপের অতল নিমজ্জনে। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, আকুতি জানান, ও নিজেকে তার দরবারে বিলীন করবার উত্তম পন্থা হল : আত্মার পরিমার্জন ও উন্নতিকল্পে একাকিত্ব যাপন—তার অপূর্ণতাগুলো ঢেকে দেয়া, হিম্মত ও প্রতিজ্ঞার সঞ্চার, আল্লাহ ও আখেরাতের পথে নিজেকে মহীয়ান করে গড়ে তোলা—সন্দেহ নেই, এ উদ্দেশ্য রূপায়ণে এতেকাফই হচ্ছে বান্দার জন্য সর্বোত্তম উপায়।

আধুনিকতা ও সংস্কৃতির ছায়ায় গড়ে উঠছে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম, তাদের প্রতি ন্যুনতম লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন—মহত্ত্ব ও কল্যাণের সর্ব-ব্যাপকতা সত্ত্বেও, তারা এ সুন্নতকে পরিত্যাগ করছেন অনায়াসে, তাই, আত্মার পরিমার্জন ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কোনভাবে। যদিও কোন কোন শ্রেণির মাঝে এই সুন্নত বিস্তার লাভ করছে ধীরে ধীরে, কিন্তু এখনও তাদের ও তাদের কর্মের মাঝে রাসূলের প্রদর্শিত হেদায়েত বিরোধী কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কিংবা এতেকাফের উদ্দেশ্য ও আদব ক্ষুণ্ণ হয় নানাভাবে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল :—

এতেকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য বিরোধী ও একাগ্রতা বিনষ্টকারী যে বিষয়টি সর্বপ্রথম লক্ষণীয়, তাহল, মোবাইল ব্যবহার। আল্লাহর তরে অন্তরের নিবিষ্টতা, পার্থিব যাবতীয় সম্পর্ক ও যোগাযোগ হতে কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছিন্নতা, জিকির ও ধ্যানে অবগাহন—ইত্যাদি চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘিত হয় মোবাইল ব্যবহারের ফলে।[1]

---

[1] ইবনে উসাইমিন তার রচিত মাজমুউ ফাতাওয়া-তে উল্লেখ করেন (খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৫৮) এতেকাফকারী পার্থিব যাবতীয় বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত রাখবে, সুতরাং, বেচা-কেনা ও ব্যবসায় নিজেকে জড়াবে না।

তবে, মুসলমানদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোন কর্মে শর্তহীনভাবে কি মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ ? এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। মূলত: যদি এতেকাফের শরয়ি উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা ক্ষুণ্ন না হয়, লজ্ঘিত না হয় তার মৌলিক উদ্দেশ্য, তবে শর্তহীনভাবে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে না। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে উসাইমিন বলেন : এতেকাফরত অবস্থায় মোবাইল যদি মসজিদে থাকে, তবে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার বৈধ। কারণ, এর ফলে তাকে মসজিদ থেকে বের হতে হচ্ছে না। তবে, যদি মসজিদের বাইরে হয়, তাহলে ব্যবহার করবে না। কেউ যদি মুসলমানদের প্রয়োজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তবে সে এতেকাফ পালন করবে না। কারণ, মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ করা এতেকাফের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের কল্যাণ সর্বব্যাপী ও প্রবৃদ্ধিশীল, এতেকাফের পরিসর সংক্ষিপ্ত। তবে সংক্ষিপ্ত ও প্রবৃদ্ধি-বিলগ্ন বিষয়ও যদি হয় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হুকুম, তবে তা পালন করাই হবে আবশ্যকীয়।[1]

কেউ কেউ পিতা-মাতার আদেশ উপেক্ষা করে এতেকাফ পালন করে। এতেকাফ সুন্নত, পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব। সুন্নতের তুলনায় ওয়াজিব পালন অগ্রগামী—সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করেন :—

وما تقرب إليَّ بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه.

আমার আরোপিত ফরজই বান্দাকে আমার নিকটবর্তীকারী আমলের মাঝে সর্বাধিক প্রিয়।[2]

সুতরাং, ফরজ পালনই বান্দার জন্য অধিক যুক্তিযুক্ত ও অগ্রগণ্য। আল্লামা ইবনে উসাইমিন এ বিষয়ে যে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান

---

[1] ইবনে উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৮০।

[2] বোখারি : ৬৫০৩।

করেছেন, এখানে তার উল্লেখ খুবই সময়োচিত বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন :—

তোমার পিতা যদি তোমাকে এতেকাফে বাধা প্রদান করে এবং এতেকাফ ত্যাগ করার মত যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে, তবে তুমি এতেকাফ পালন কর না। কারণ, হয়তো এ ব্যাপারে তিনি তোমার মুখাপেক্ষী। এতেকাফ ত্যাগ করার মত প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের মানদণ্ডও তার কাছে, তোমার কাছে নয়। তুমি যে মানদণ্ড মান্য কর, এতেকাফের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে হয়তো তা সঠিক ও ন্যায্য নয়। তবে, পিতা যদি প্রয়োজনীয় বিষয়টির উল্লেখ করে কল্যাণের ব্যাখ্যা না করেন, তবে, এক্ষেত্রে তার আদেশ কায়মনোবাক্যে মান্য করা তোমার জন্য আবশ্যক নয়। কারণ, এমন বিষয়ে তাকে তোমার মান্য করার প্রয়োজন নেই, যা কল্যাণ শূন্য।[1]

কেউ কেউ অসময়ে নিদ্রা, অনর্থক আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। এগুলো এড়িয়ে যাওয়া এতেকাফকারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।

হাদিসে দিবস ও রাতের যে সকল সময়-নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট সুন্নত উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন : ফরজ সালাতের পূর্বে ও পরে পালিত সুন্নত, দ্বিপ্রহরের সুন্নত, ওজুর সুন্নত, জিকির-আজকার ও কোরআন পাঠ, এতেকাফকারীদের সাথে দ্বীনি আলোচনায় অংশগ্রহণ, সালাতে প্রথম কাতারের সংরক্ষণ, সালাত শেষে নির্দিষ্ট জিকির পাঠ—ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেউ কেউ অনীহ আচরণ করে থাকে। এ এবাদত ও জিকির-আজকারের মাধ্যমে এতেকাফকারীর সময়গুলো হিরণ্ময় হয়ে উঠে, বিশুদ্ধ হয় তার আত্মা, পূরণ হয় এতেকাফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

নিজ এলাকা ও দেশের বাইরে সফররত অবস্থায় যারা এতেকাফ পালন করেন,—যেমন হারামাইন—সফরের কারণ প্রদর্শন করে নফল

---

[1] ইবনে উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৫৯।

সালাত ত্যাগ করেন, এ কোনভাবেই ঠিক নয়। কারণ, সফরে থাকা সত্ত্বেও রাসূল নফল সালাত হতে বিরত থাকতেন না। রাসূল বরং, জোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নত ত্যাগ করতেন, অন্যান্য নফল এবাদতগুলো যথাযথভাবেই পালন করতেন।[1]

রমজানে রাসূল সা.-এর শেষ দশ দিন যাপন

রমজানের শেষ দশ দিনে, এতেকাফকালীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন এবাদত-বন্দেগিতে কাটাতেন, পরিশ্রম করতেন কঠোরভাবে।

হাদিসে এসেছে, উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা. বলেন : রমজানে লোকেরা মসজিদে সালাত আদায় করত...(উক্ত হাদিসের একাংশে আছে, রাসূল সকলকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন—) হে লোক সকল ! আল-হামদুলিল্লাহ ! আজ রাত আমি গাফলতিতে যাপন করিনি। এবং তোমাদের অবস্থানও আমার অবিদিত নয়।[2]

ভিন্ন এক হাদিসে আয়েশা বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমজানের শেষ দশ দিনে অধিক-হারে পরিশ্রম করতেন।[3]

অপর বর্ণনায় তিনি বলেন : শেষ দশ দিনে প্রবেশ করে রাসূল রাত্রি জাগরণ করতেন, পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন এবং পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, পরিশ্রম করতেন।[4]

'শেষ দশ দিনে প্রবেশ করে তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন'— হাদিসের এ অংশ দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রথম বিশ দিন রাসূল পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করতেন না, বরং, কিছু সময় এবাদত করতেন, ঘুমিয়ে

---

[1] ইবনে উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

[2] আবু দাউদ : ১৩৭৪, হাদিসটি সহি।

[3] মুসলিম : ১১৭৫।

[4] মুসলিম : ১১৭৪।

কাটাতেন কিছু সময়। শেষ দশ দিনে তিনি, এমনকি, বিছানাতেও গমন করতেন না। রাতের পুরোটাই এবাদতে ব্যয় করতেন।[1]

হাদিসগুলো প্রমাণ করে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দশ দিন এবাদতে হতেন কঠোর পরিশ্রমী, আল্লাহর দরবারে নিজেকে পেশ করতেন নতজানু ও বিনয়াবনত রূপে। সালাত, সিয়াম, সদকা, কোরআন পাঠ, জিকির, দোয়া, তাওয়াক্কুল, আশা ও ভীতি, মোহাসাবা, তওবা, অন্তরের একাগ্র উপস্থিতি—ইত্যাদি এবাদতের মৌলিক বিষয়গুলো তিনি পূর্ণভাবে রূপায়ণ ও সম্মিলন করতেন এ কয় দিনে।

রাসূলের সেই হেদায়েত অনুসারে আমাদের অবস্থা বিচার করলে সহজে আমাদের অবস্থা ও চিত্র ফুটে উঠে—যা খুবই হতাশাকর, দুর্গতি আক্রান্ত ও অশুভ পরিণতিময়।

লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান ও তাতে রাত্রি-জাগরণ

লাইলাতুল কদর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, যাতে তার অনুসন্ধিৎসু ও গাফেলদের মাঝে সরল পার্থক্য করা যায়। রাসূল কদরের রাত্রির অনুসন্ধানে রাত্রি-জাগরণ করতেন, ব্যস্ত সময় যাপন করতেন। আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :—

إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أُتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف؛ فاعتكف الناس معه.

[1] আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এক যইফ হাদিসে (মুসনাদ : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৬) এসেছে— প্রথম বিশ দিনে রাসূল ঘুম ও এবাদতে কাটাতেন। শেষ দশ দিনে পুর্ণভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এবাদতে নিমগ্ন হতেন।

এ রাতের অনুসন্ধানে প্রথম দশ দিন আমি এতেকাফে যাপন করলাম, পরবর্তীতে যাপন করলাম মধ্যবর্তী দশ দিন। অত:পর ওহির মাধ্যমে আমাকে অবগত করানো হল যে, সে রাত আছে শেষ দশ দিনে। সুতরাং, তোমাদের যে এতেকাফে আগ্রহী সে যেন এতেকাফ করে। তাই, লোকেরা তার সাথে এতেকাফ পালন করল।[1]

রমজান বিষয়ক রাসূলের আদর্শ, হেদায়েত, ও যাপন পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি ফুলে উঠে যে, রাসূল অত্যন্ত আগ্রহ, প্রেরণার মাধ্যমে কদরের রাত অনুসন্ধান করতেন, জাগরণ করতেন পূর্ণ রাত্রি। অন্য যে কোন রাতের তুলনায় অধিক ফজিলতময় হওয়ার ফলেই কেবল রাসূল তাকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কদর হচ্ছে শান্তি ও বরকতের রাত, মর্ত্যলোকে নেমে আসে এ রাতে আকাশের ফেরেশতাগণ, তা হাজার রাতের তুলনায় উত্তম ও সৌভাগ্য-মণ্ডিত। ইমান ও ইহতিসাব সহকারে যে এ রাত যাপন করবে, তার পূর্ব জীবনের সকল গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

এ মোবারক রাত্রিতে এবাদতকারীদের জন্য বিশেষভাবে যা কর্তব্য ও পালনীয়, তাহল, মাগরিব ও এশার সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করা। কারণ, মোস্তাহাব আমলের জন্য ওয়াজিব আমল পরিত্যাগ বৈধ নয় ; ফরজ আমলের তুলনায় ভিন্ন কোন এবাদত বান্দাকে এতটা নিকটবর্তী করতে পারে না। ইমাম যাহ্হাক বলেন : রমজানে যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার সালাত নিয়মিত আদায় করে যাবে, সে অবশ্য লাইলাতুল কদরের সওয়াবের অংশীদার হবে।[2] বান্দার জন্য আল্লাহর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দান হচ্ছে দ্বীন বিষয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, আপন ইচ্ছা ও খেয়ালে নয়, আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে তার নৈকট্য অর্জন ও রাসূলের অনুসরণ।

---

[1] মুসলিম : ১১৬৭।

[2] মাওয়াযি : কেয়ামে রমজান : পৃষ্ঠা : ৯২।

লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান-এবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে একই শ্রেণিভুক্ত। কারণ, রাসূল এ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়েছেন। উমর রা. হতে প্রমাণিত : রাত্রি যাপনের জন্য যখন সকলে মিলিত হল, তিনি পুরুষদের দায়িত্ব দিলেন উবাই বিন কাব-কে, সুলাইমান বিন আবি হাসামাকে দিলেন নারীদের দায়িত্ব।[1] আফজা হতে বর্ণিত, আলী রা. সকলকে রমজানে রাত্রি জাগরণের আদেশ দিতেন। পুরুষ ও নারীদের জন্য তিনি পৃথক-পৃথক ইমাম নির্ধারণ করতেন। তিনি বলেন : আমাকে আদেশ করলে আমি মেয়েদের ইমামতি করলাম।[2]

সুতরাং, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কর্তব্য কদরের রাত্রি অনুসন্ধান করা এবং রাত জেগে এবাদত-বন্দেগি করা। লাইলাতুল কদর—সন্দেহ নেই, বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক বড় নেয়ামত, যাতে এবাদত হাজার গুণে বৃদ্ধি পায়, রহমত বর্ষিত হয় সকলের উপর। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ রাতের যথোপযুক্ত সম্মান দানের মাধ্যমে কল্যাণ ও সৌভাগ্য হাসিলের তৌফিক দান করুন। আমিন।

জিবরাইল আঃ-এর সাথে রাসূলের কোরআন অনুশীলন

কোরআনের প্রতি গুরুত্বারোপ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কুঞ্জিকা। অপরের সাথে কোরআন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা কোরআনের গভীর জ্ঞান, মর্ম উপলব্ধির সহজ মাধ্যম। পারস্পরিক কোরআন বিষয়ক আলোচনা সততা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা সদৃশ। রমজানে কোরআন শিক্ষায় রাসূলের সহপাঠী হওয়ার জন্য জিবরাইল আঃ আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। এ বিষয়ে হাদিসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়—

---

[1] বাইহাকি : সুনানে কুবরা : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৪।

[2] আব্দুর রাজ্জাক : ২৫/৫।

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, জিবরাইল আ: রমজানের প্রতি রাতে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ফজর অবধি তার সাথে অবস্থান করতেন। রাসূল তাকে কোরআন শোনাতেন।[1] আরো এসেছে, রাসূল তার প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে গোপনে জানালেন যে, জিবরাইল প্রতি বছর আমাকে একবার কোরআন শোনাতেন এবং শুনতেন, এ বছর তিনি দু বার আমাকে শুনিয়েছেন-শুনেছেন। একে আমি আমার সময় সমাগত হওয়ার ইঙ্গিত বলে মনে করি।[2]

ইবনে হাজার বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমজান হতে অন্য রমজান অবধি যা নাজিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন।[3]

হাদিসগুলো একে অপরের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিদর্শন। রমজানে উত্তম সাহচর্য নির্ধারণ এ কারণেই আবশ্যক ; উত্তম সাহচর্যের ফলে সময়ের সর্বোত্তম সুফল লাভ হবে—সন্দেহ নেই। কুসংসর্গের ফলে এ বরকতময় মাসেও অনেকের সময় পাপের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট বিরল নয়। এক্ষেত্রে, সুতরাং, বান্দার জন্য অধিক তাকওয়া অবলম্বন জরুরি। মানুষ যাকে বন্ধু ও আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে, অভ্যাস-আচরণ ও ধর্মাচারে প্রবলভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এ কারণে বন্ধু নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কোরআন শিক্ষা, দিবসের তুলনায় রাতে কোরআন তেলাওয়াতের অধিক ফজিলত[4], রমজানে কোরআন তেলাওয়াত বেশি পুণ্যময় ও

---

[1] বোখারি : ১৯০২।

[2] বেখারি : ৩৬২৪।

[3] ফাতহুল বারি : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২।

[4] তবে, কেউ যদি মনে করে যে, দিবসে কোরআন তেলাওয়াত তার জন্য অধিক উপকারি, তাহলে তাই তার জন্য অধিক ফজিলতপূর্ণ।

কল্যাণকর হওয়া, উত্তম সাহচর্যের ফলে আত্মিক উত্তম ফলশ্রুতি লাভ—ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত হাদিস একটি প্রামাণ্য দলিল।

ইবনে হাজার বলেন : তেলাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মিক উপস্থিতি ও উপলব্ধি।[1]

ইবনে বাত্তাল বলেন : রাসূলের এ কোরআন শিক্ষা ও অনুশীলনের একমাত্র কারণ ছিল পরকালের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুল ভাবনার জাগরণ এবং পার্থিব বিষয়ে অনীহার সৃষ্টি করা।[2]

অত্যন্ত আনন্দ ও সুখের বিষয়, বর্তমান সময়ে রমজানে একবার বা দু বার কোরআন খতমের ব্যাপক আগ্রহ মানুষের মাঝে দেখা যায়। সন্দেহ নেই, এ হবে মানুষের জন্য ব্যাপক কল্যাণবাহী। তবে, তারাবীহে যে তেলাওয়াত করা হয়, তেলাওয়াত ও সুর মাধুর্যের নানা কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে মর্ম উপলব্ধি ও গভীর চিন্তার প্রয়োগ হয় না। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন—

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [ص: ٢٩].

এ এমন এক কিতাব—বরকতময়—যা আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতগুলোয় গভীর চিন্তা করে এবং জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[3]

সন্দেহ নেই, এ সম্মানিত সময়ের সবটুকু কল্যাণ নিংড়ে নেয়া সকলের কর্তব্য। সালফে সালিহীন হতে প্রমাণিত, এ সময়ে তারা সালাত ও অন্যান্য উপলক্ষে দীর্ঘক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতেন—এমনকি, ইমাম যুহরি বলেন : রমজান হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত ও আহার বিতরণের মাস ;[4] রমজান মাস আরম্ভ হলে ইমাম মালেক হাদিস অধ্যয়ন

---

[1] ফাতহুল বারি : খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৫।

[2] ইবনে বাত্তাল : শরহে বোখারি : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩।

[3] সূরা সোয়াদ : আয়াত ২৯।

[4] ইবনে আব্দুল বার : আত তামহীদ : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১১।

ও আহলে ইলমের সাথে ইলমি আলোচনা ও সভা-সমাবেশ পরিত্যাগ করে কোরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন হতেন।[1]

তাদের অধিকাংশই, বরং, স্বল্প সময় ব্যয়ে কোরআন খতম করতেন—দশ, সাত বা কেউ কেউ মাত্র তিন দিনে।[2] উম্মতের মহান ইমামদের যারা বছরের পুরোটা সময় সতত নিরত থাকতেন কোরআনের আয়াতগুলো বুঝা ও মর্ম উপলব্ধিতে, তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায়, এটি খুবই সম্ভব ; কিন্তু যারা কেবল রমজান মাসেই কোরআন তেলাওয়াতের কথা স্মরণ করে, তাদের পক্ষে এ কখনোই সম্ভব হতে পারে না। রাসূল এক হাদিসে বলেছেন—

لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.

তিন দিনের কমে (পূর্ণ) কোরআন কেউ পাঠ করলে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।[3]

কোরআনের উদ্ধৃতিগুলোর সত্যায়ন ও আহকামের পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতেই কোরআন তেলাওয়াত কাম্য। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন:—

إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار.

কোরআন নিশ্চয় সুপারিশকারী, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, সে আল্লাহর কাছে হবে সত্যায়িত-গৃহিত আবেদনকারী, যে কোরআনকে স্থাপন করবে সম্মুখে, কোরআন তাকে জান্নাতের দিশা দেবে, আর যে স্থাপন করবে পশ্চাতে, কোরআন তাকে টেনে নিয়ে যাবে জাহান্নামে।[4]

---

[1] ইবনে রজব : লাতায়েফুল মাআরেফ : পৃষ্ঠা : ১৮৩।

[2] ইবনে রজব : লাতায়েফুল মাআরেফ : পৃষ্ঠা : ১৮৩।

[3] ইবনে হিব্বান : ৭৫৮, হাদিসটি সহি।

[4] আব্দুর রাজ্জাক : ৬০১০।

কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এটিই ছিল রাসূলের সুমহান পদ্ধতি। আবু আব্দুর রহমান সালামি বলেন : কোরআনের মহান পাঠকগণ—যেমন উসমান বিন আফ্‌ফান, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও অন্যান্যগণ, আমাদের জানিয়েছেন, রাসূলের নিকট হতে তারা দশটি আয়াত লাভ করার পর তার মর্ম-কর্ম বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ ব্যতীত এগিয়ে যেতেন না। তারা বলেছেন : আমরা একই সাথে কোরআন, তার ইলম ও আমলের জ্ঞান অর্জন করেছি। আল্লামা সুয়ূতী বলেন : এ কারণেই তারা একটি সূরা মুখস্থ করার জন্য সময় নিতেন।[1]

কোরআন তেলাওয়াতকারীর, সুতরাং, কর্তব্য হল : তার কর্ম ও কথনে সঠিক ও সৎ পথের অনুসারী হওয়া। ইবনে মাসউদ রা. বলেন:—

ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون، و بنهاره إذ الناس يفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، و ببكائه إذ الناس يختالون.

কোরআনের বাহকের উচিত রাতে কোরআনে মগ্ন হওয়া—যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন হয় ; এবং দিনে—যখন মানুষ পানাহারে লিপ্ত হয়, এবং দু:খে—যখন মানুষ আনন্দে উদ্বেল হয় ; এবং কান্নার সময়—যখন মানুষ অহংকারে স্ফীত হয়।[2]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন : কোরআন বিষয়ে সমালোচক ও মূর্খদের সংসর্গ যাপন কোরআনের বাহকের জন্য উচিত নয়। বরং, সে হবে ক্ষমাশীল, ঔদার্যময়।[3]

হাসান বলেন :—

---

[1] সূয়ূতী : ইতকান : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৮।

[2] বাইহাকি : শুআবুল ঈমান : ১৮০৭।

[3] কুরতবি, আল জামে লি আহকামিল কোরআন : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩।

إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جَمَلا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم، فكانوا يتدبروها بالليل وينفذوها بالنهار.

তোমরা কোরআন শিক্ষাকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে নিয়েছ। রাতে তোমরা কোরআন শিক্ষায় অতিবাহিত কর। আর তোমাদের পূর্বসূরীগণ কোরআনকে মনে করতেন প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত বার্তা স্বরূপ। রাতে তারা এর শিক্ষায় মগ্ন হতেন, দিনে প্রয়োগ করতেন।[1]

যাদেরকে আল্লাহ কোরআন শিক্ষায় ভূষিত করেছেন, দান করেছেন এ মহান নেয়ামত, তারাই যখন ছিলেন এমন ব্যাকুল ও কোরআন শিক্ষার অতিশয় আগ্রহে মগ্ন, সুতরাং, আমরা কেন, কি কারণে পিছিয়ে যাব ? কোরআনে উক্ত মহান ব্যক্তিদের উল্লেখ করে এরশাদ করা হয়েছে—

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমার। যখন আমি তা পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর। অত:পর তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমারই।[2] কোরআনের এ আয়াত ও বর্ণনাগুলো নিশ্চয় আমাদের নতুন উদ্যমে কোরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করার পথে আগ্রহী করে তুলবে ! কোরআনের মর্ম ও উপলব্ধি, জ্ঞান ও হেদায়েত আমাদের আত্মাকে করবে আরো প্রসারিত-প্রশস্ত, পার্থিব ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক ও কল্যাণকামী।

কোরআন শিক্ষা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সকলের সাথে সহপাঠ, সম্মিলিত অনুশীলন না একাকী তেলাওয়াত উত্তম ?—এ ব্যাপারে নানা মত থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি পাঠক ও তেলাওয়াতকারীর মানসিকতা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সকলের সাথে সমবেত হয়ে

---

[1] গাজ্জালী : ইহয়াউ উলুমিদ্দীন : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৫।

[2] সূরা কেয়ামত : আয়াত : ১৭, ১৮।

সহপাঠ বা অনুশীলন যদি তেলাওয়াতকারীর নিকট উত্তম ও অধিক একাগ্রতা-বিনয় উদ্রেককারী মনে হয়, তবে তাই উত্তম, অন্যথায়, তার মানসিকতা অনুসারে একাকী-নির্জনতা বেছে নিবে, মগ্ন হবে ঐকান্তিক নীরবতায়।[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতা, সকলের সাথে সমান এহসানপ্রবণ আচরণ, বিনয়, যুহুদ, অপরকে প্রাধান্য প্রদান—ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোরআনের সহপাঠ কীভাবে ক্রিয়া করত, আগামীতে আমরা তা আলোচনা করব।

কোরআনের প্রতি সর্বস্ব নিবেদন ও আকুতি দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য খুবই সহায়ক, আনুগত্য ও এবাদতে বিপুলতা আনয়নকারী এবং সৎকাজের উদগাতা। এ ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ব্যক্তি এ সকল সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেকে ভূষিত করতে সক্ষম হবে সন্দেহ নেই।

বর্তমান মুসলিম সমাজের দূরাবস্থার সচেতন যে কোন সমাজ-পাঠকই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন : উম্মতের অধিকাংশ দূরবস্থার সূচনা কোরআনের বর্জনের সূত্র ধরে। কোরআনকে হেলা করেছে বলেই জাতি ও উম্মত হিসেবে মুসলিম উম্মাহ আজ সবার চোখে, যাবতীয় সক্রিয় ক্ষেত্রে হেলার পাত্র। কোরআনের সামাজিক পাঠ দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ তাদের অস্তিত্বের ভীত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বলয়। কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ-অনুবর্তন ব্যতীত এই 'তীহ' হতে আমাদের মুক্তি নেই, অনবরত তাতেই আমাদের ঘুরপাক খেতে হবে দীর্ঘ লাঞ্ছিত-কাল ধরে। কোরআন তেলাওয়াত, গবেষণা, সর্বাত্মক আমল ও কোরআনের শাসন প্রণয়ন—ইত্যাদি হবে আমাদের এ পথ উত্তরণের স্তর ও পর্ব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

রাসূলের বিনয় ও যুহুদ

---

[1] ইবনে উসাইমিন : মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৭৮।

যার অন্তর লীন হয়েছে, বিনম্র হয়েছে মহান সত্ত্বার সামনে, সন্ধান পেয়েছে প্রকৃত মাবুদের, অনুভব করেছে আত্মিক দৌর্বল্যের, বিনয়-যুহুদ তার পরিচয় ও নিদর্শন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—রবের পরিচয় লাভ ও তার তরে লীন হওয়ার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ—এমন পরিচয় ও নিদর্শনই ধারণ করেছিলেন নিজের জন্য। শরিয়ত, শরিয়ত প্রদত্তার মহত্ত্ব, তার সাথে সম্পর্কের প্রবৃদ্ধি, পার্থিবে অনাসক্তি ও পরকালে প্রবল আসক্তি—ইত্যাদির জন্য অন্তরের বিনয় ও নিবেদনের মাধ্যমে এ মারেফাত ও আল্লাহ ভীতির জন্ম নেয়। অভ্যাস ও আচরণের নানা ক্ষেত্রে রাসূল যুহুদ অবলম্বন করতেন, আচরণে অবলম্বন করতেন বিনয়ের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা।

রাসূল এক চাটাইতে পূর্ণ রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন :—

كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً، فأمرني رسول الله صلي الله عليه و سلم فضربتُ له حصيراً فصلى عليه.

রমজানে লোকেরা মসজিদে দলে দলে সালাত আদায় করত ; রাসূল আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তার জন্য একটি চাটাই বিছিয়ে দিলাম, তিনি তাতে সালাত আদায় করলেন।[1]

রাসূল রমজানে এতেকাফ পালন করতেন একটি তুর্কি তাঁবু টানিয়ে, যার প্রবেশমুখে ঝুলান থাকত একটি চাটাই। আবু সাইদ খুদরি বর্ণিত হাদিসে এসেছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ পালন করলেন একটি তুর্কি তাঁবুতে, যার প্রবেশমুখে ছিল একটি চাটাই। তিনি বলেন : রাসূল স্বহস্তে উক্ত চাটাই ধরে একপাশে সরিয়ে দিলেন, অত:পর মুখ বের করে মানুষের সাথে কথা বললেন।[2]

---

[1] আবু দাউদ : ১৩৭৪, হাদিসটি হাসান।

[2] ইবনে মাজা : ১৭৭৫, হাদিসটি সহি।

শুকনো খেজুর পাতায় নির্মিত তাঁবুতে রাসূল এতেকাফ পালন করতেন। ইবনে উমর রা. বলেন : রাসূল রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ পালন করলেন, তার জন্য শুকনো খেজুর পাতা দিয়ে গৃহ-সদৃশ বানান হল।[1] মসজিদের ছাদ দিয়ে তার জায়নামাজে পানি গড়িয়ে পড়ত, তিনি মাটি আর কাদাতেই সেজদা করতেন। আবু সাইদ খুদরি রা. বর্ণিত হাদিসে আছে—...সে রাতে আকাশ-ঝেপে বৃষ্টি হল, একুশ তারিখের রাতের ঘটনা, রাসূলের জায়নামাজে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। রাসূলের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি দেখলাম, সকাল হয়ে এসেছে, পানি আর কাদায় তার মুখমণ্ডল মাখামাখি হয়ে আছে।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই সাদামাটাভাবে ইফতার ও সেহরি গ্রহণ করতেন। তার খাদেম আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন : রাসূল সালাত আদায়ের পূর্বে কয়েকটি ভেজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, ভেজা খেজুর না হলে শুকনো খেজুর গ্রহণ করতেন। শুকনো খেজুরও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ইফতার করতেন।[3] অপর এক হাদিসে তিনি বলেন : একদা সেহরিকালে রাসূল আমাকে লক্ষ্য করে বলেন—

يا أنس إني أريد الصيام؛ أطعمني شيئاً!، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال.

হে আনাস আমি রোজা রাখতে আগ্রহী, আমাকে কিছু আহার করাও। আমি তার জন্য খেজুর ও এক পাত্রে পানি এনে হাজির করলাম। এ ছিল বেলালের (প্রথম) আজানের পরে।[4]

---

[1] আহমদ : ৫৩৪৯, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ২০১৮।

[3] তিরমিজি : ৬৯৬, হাদিসটি সহি।

[4] নাসায়ি : ২১৬৭, হাদিসটি সহি।

তিনি ছিলেন খুবই স্বল্পাহারী। যামারা বিন আব্দুল্লাহ বিন আনিস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন : আমি বনি সালামার এক মজলিসে বসা ছিলাম—আমি ছিলাম তাদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ—তারা বলাবলি করল, লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আমাদের পক্ষ হতে রাসূলকে কে প্রশ্ন করবে? এটি ছিল একুশে রমজানের সকালের ঘটনা। আমি বেরিয়ে মাগরিবের সালাতে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম। অত:পর তার গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হলে তিনি পাশ দিয়ে গমন করলেন। বললেন, প্রবেশ কর। প্রবেশ করলে আমাকে তার রাতের খাবার প্রদান করা হল। তিনি দেখতে পেলেন খাদ্য স্বল্পতার কারণে আমি খাদ্যগ্রহণ হতে বিরত থাকছি।[1]

এ থেকে প্রমাণ হয় রাসূলের হেদায়েত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জুড়ে রয়েছে বিনয় ও যুহুদ। বিনয় ও যুহুদের অর্থ হল : পরকালে কল্যাণ সাধন করে না, এমন যাবতীয় কিছু পরিহার করা, উদারতা, লোক-দেখানো জাঁকজমক না করা, পার্থিব বিষয় যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া, কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বন, জরাজীর্ণ বেশ ধারণ—ইত্যাদি ; যেন আত্মা প্রবৃত্তির দাসত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত না হয়ে পড়ে। এবাদতের মৌলিকত্ব হল আত্মার বিনয়, আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সাথে শরিয়তের প্রতি সর্বস্ব নিয়োগ। পার্থিবের সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক, তার জাঁকজমক নিয়ে সর্বদা মেতে থাকা এ পথের সবচেয়ে বড় বাধা। এর মাধ্যমে প্রমাণিত যুহুদ ও বিনয়ের সর্বনিম্ন স্তর অর্জন যে কোন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে মৌলনীতি হচ্ছে : বান্দা হারাম প্রবৃত্তির পরওয়া করবে না বিন্দুমাত্র, বৈধ হোক কিংবা অবৈধ—ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে যে বিষয় বাধা, তাকে এড়িয়ে যাবে দৃঢ়তার সাথে।

তবে, এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রবৃত্তির যে কোন আস্বাদকে মানুষ সর্বদা এড়িয়ে যাবে ; প্রকারান্তরে যা পর্যবসিত হয় পার্থিব বৈরাগ্যে,

---

[1] আবু দাউদ : ১৩৭৯, হাদিসটি হাসান।

আল্লাহ তাআলা ইসলামকে এ জাতীয় অসামাজিক বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন। আমরা বরং, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ও তার পুণ্যবান সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব, বিচার-বিশ্লেষ ব্যতীত কোন বিষয়কে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাব না, কিংবা গ্রহণ করব না অমূলকভাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়েত দান করুন, প্রদর্শন করুন সঠিক ও ঋজু পথ।

এই সূত্র ধরে বলা যায়, মৌলিকভাবে সম্পদ অর্জন অবাঞ্ছিত নিন্দনীয় বিষয় নয়, তবে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বান্দাকে আল্লাহর তরে অন্তরকে করে তুলতে হবে বিনয়ী, একমুখী ; অন্তরের প্রশান্তি ও সন্তোষ সম্পদে নয়, পেতে হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, পরকালীন চিন্তাই হবে তার সার্বক্ষণিক চিন্তা ও ধ্যান, সাফল্যের মাপকাঠি। যুহুদের প্রকৃত স্বরূপ এর মাঝেই নিহিত। সম্পদ চিন্তা ও মোহে আকণ্ঠ নিমজ্জন, সম্পদের অর্জন ও প্রবৃদ্ধির লালসা—যুহুদের সাথে এগুলোর ন্যুনতম সম্পর্ক নেই ; টাকা ও অর্থের দাসত্বের অনুরূপ এগুলো হচ্ছে পার্থিবের দাসত্বের প্রতিফল।

অধিক-হারে সদকা ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে অধিক সৎকাজ করতেন, সদকা করতেন বিপুল পরিমাণে। কোরআন পাঠ ও তার আলোকে জীবন যাপনের অলৌকিক ফলশ্রুতি হচ্ছে এ পুণ্য চরিত্রের স্ফুরণ। ইবনে আব্বাস এক হাদিসে বলেন : রাসূল ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক দানশীল। রমজানে তিনি সর্বাধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাইলের সাথে তার সাক্ষাৎ হত। রমজানে জিবরাইল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তার সাথে কোরআন পাঠ করতেন। জিবরাইল আ:-এর সাথে সাক্ষাৎকালীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেন মুক্ত বায়ুর তুলনায় অধিক কল্যাণময় দানশীল।[1]

অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজানে তার দানের আধিক্যের কারণ, কোরআন পাঠ তার আত্মার প্রাচুর্য বৃদ্ধির প্রত্যয়ের নবায়ন করত। আত্মিক এ প্রাচুর্যই হত তার দানশীলতার কারণ।[2]

রাসূলের দানশীলতা ছিল সর্বব্যাপী, দানের যাবতীয় প্রকারের সম্মিলন হত তাতে। দ্বীনের বিজয়, মানুষের হেদায়েতের জন্য তিনি আল্লাহর রাস্তায় সমভাবে ব্যয় করতেন ইলম, নফ্স ও সহায়-সম্পদ। অজ্ঞদের শিক্ষাদান, তাদের সর্বাত্মক প্রয়োজন পূরণ করতেন ও অন্নদান করতেন ক্ষুধার্তদের।[3]

‘কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুক্ত বায়ুর তুলনায় অধিক দানশীল’—ইবনে আব্বাসের এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, রমজানে রাসূল দান ও এহসানে ছিলেন সকলের তুলনায় অগ্রবর্তী ব্যক্তিত্ব ; মুক্ত বায়ুর দান যেমন পৌঁছে যায় সম্মিলিতভাবে সকলের কাছে, রাসূলের দানে বিধৌত হতেন তেমনি সকলে, নির্বিশেষে। ইবনে মুনায়্যির উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন : দরিদ্র, প্রয়োজনগ্রস্ত ও ধনী—

---

[1] বোখারি : ৩২২০।

[2] ফাতহুল বারি : ইবনে হাজার : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১।

[3] ইবনে উসাইমিন : মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৬২।

সকলের কাছে পৌঁছে যেত রাসূলের দানের কল্যাণ, মুক্ত শীতল প্রবাহিত বায়ুর পর আসে বৃষ্টির যে ঝাপটা, রাসূলের দান হত তার চেয়েও কল্যাণকর ও সর্বব্যাপী।[1]

রাসূলের পুণ্যময় অভ্যাস ও চরিত্রে, আচরণ-নিষ্ঠায় এ ছিল কোরআনের প্রভাব, যুহুদের ফলশ্রুতি, রহমানের সাথে সার্বক্ষণিক সুসম্পর্কের সুখকর অবশ্যম্ভবি পরিণতি।

এ মাসে, তাই, মুসলিম মাত্ররই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত অধিক-হারে ব্যয়-দান ; ইমাম শাফেয়ী বলেন : রাসূলকে অনুসরণ করে ব্যক্তি এ মাসে অধিক হারে দান করবে, এ খুবই পছন্দনীয় বিষয়। কারণ, অধিকাংশ মানুষ এ সময় সালাত ও রোজা পালনে ব্যস্ত থাকার ফলে উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে এ দান তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।[2]

দানশীলতা ছিল রাসূলের জীবনের সর্বাধিক মহিমান্বিত প্রকাশ্য অভ্যাস, এ গুণ ছিল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, মুহূর্তের জন্য একে তিনি ত্যাগ করেননি। তিনি কখনো কিছু কুক্ষিগত করেননি কিছু, প্রার্থনা করার পর কাউকে না করেননি কখনো। তার এ আচরণের সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখা যেত রমজানের পবিত্র মৌসুমে।

হাদিস থেকে প্রমাণ হয়, লজ্জার আবরণ খসে যাওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যেত তার দানের কল্যাণ—যেমন মুক্ত বসন্ত বায়ু পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে, খরতাপদগ্ধ জমিতে জমিতে। সম্পদের নেয়ামতে আল্লাহ যাকে ভূষিত করেছেন, কিংবা ধনীদের প্রতিনিধি যে ব্যক্তি—সংস্থা অথবা ব্যক্তি, এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তাকওয়া অনুসারে আমল করা তাদের কর্তব্য।

---

[1] ফাতহুল বারি : ইবনে হাজার : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৯।

[2] বাইহাকি, মারেফাতুন সুনানি ওয়াল আসার : খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

রমজান মাসে রাসূলের জেহাদ

রমজান হত রাসূলের জন্য পরীক্ষা, ব্যয় ও আত্মদানের মাস। এ মাসে তিনি বিভিন্ন জেহাদ ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। রমজানে একই সাথে তিনি সশরীরে অংশ নিয়েছেন যুদ্ধে, এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন সেনাদল বা সারিয়া।[1]

আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমজানের ষোলো তারিখে আমরা রাসূলের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমাদের কেউ কেউ রোজা রেখেছে, কেউ ভেঙ্গেছে। ভিন্ন শব্দে এসেছে—আমরা রাসূলের সাথে রমজানে যুদ্ধে অংশ নিতাম, আমাদের কেউ রোজা রাখত, কেউ রাখত না। রোজাদার আহারকারীর উপর ক্ষোভ পোষণ করত না, এবং আহারকারীও রোজাদারের উপর ক্ষোভ পোষণ করত না।[2]

উমর বিন খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে রমজান মাসে দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি—বদর ও মক্কা বিজয়। এ উভয় যুদ্ধে আমরা পানাহার করেছি।[3]

এমনকি গাযওয়ায়ে তাবুকে—যে যুদ্ধে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ইসলামের সালতানাত সুদৃঢ় হয়েছে, নবম হিজরিতে যে যুদ্ধে রাসূল মদিনা হতে বের হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন রমজানে,— সেটিও সংগঠিত হয় রমজান মাসে।[4]

স্বশরীরে অংশ না নিয়ে রাসূল এ মাসে বিভিন্ন যুদ্ধ দল নানাস্থানে জেহাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছেন। শাম হতে

---

[1] রাসূল স্বশরীরে যে যুদ্ধে অংশ নিয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, তাকে বলা হয় 'গাযওয়া'। আর যেখানে কেবল সেনাদল প্রেরণ করেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, স্বশরীরে অংশ নেননি, তাকে বলা হয় 'সারিয়া'।

[2] মুসিলম : ১১১৬।

[3] তিমমিজি : ৭১৪।

[4] ইবনে সাদ : তাবাকাত : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৫-১৬৭।

প্রত্যাবর্তনকারী কোরাইশি কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন হামজা বিন আব্দুল মোত্তালেব উপদলকে, এ ছিল প্রথম হিজরির রমজান মাসের ঘটনা।[1] হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের রমজান মাসে, বদর যুদ্ধের পর তিনি প্রেরণ করেন আমর বিন আদির উপদল, এদের উদ্দেশ্য ছিল আসামা বিনতে মারওয়ানকে খুন করা, যে তা রচিত কবিতা দিয়ে নিন্দা করে বেড়াত ইসলামের, প্ররোচনা দিত মুসলমানদের নানাভাবে।[2] সপ্তম হিজরিতে রমজান মাসে প্রেরণ করেন আব্দুল্লাহ বিন আবি আতিক এর যুদ্ধ উপদল, যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্র-উপদলকে ঐক্যবদ্ধ-সংগঠিতকারী আবু রাফে বিন সালাম বিন আবিল হুকাইককে হত্যা করতে।[3]

ফাতহে মক্কার যুদ্ধে রাসূলের অবস্থানের ব্যাপারে কোরাইশের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য হিজরি চতুর্থ বর্ষে রমজানে আবু কাতাদা বিন রবয়ির উপদল প্রেরণ করা হয়। একই বর্ষে রমজানে যথাক্রমে উজ্জা, সুয়া ও মানাত ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয় খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস এবং সাদ বিন যায়েদ আশহালির উপদল তিনটিকে।

অন্যান্য এবাদত অব্যাহত রেখেও রাসূল ও তার সাহাবিগণের এ ধরনের সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ প্রমাণ করে রোজা পালন ব্যক্তির মাঝে এক ইতিবাচক প্রেরণা ও শক্তি জোগায়, যা একই সাথে শারীরিক ও আন্তর স্বতঃস্ফূর্ততার জন্ম দিয়ে ব্যক্তিকে করে তোলে চূড়ান্ত কল্যাণকামী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পুণ্যবান সাহাবাদের এ আদর্শ প্রমাণ করে জেহাদ ও এবাদত এবং আল্লাহর তাআলার মহব্বত

---

[1] ওয়াকিদি, মাগাযি : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৯। তাবাকাত ইবনে সাদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬।

[2] ওয়াকিদি, মাগাযি : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪। তাবাকাত ইবনে সাদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭।

[3] ওয়াকিদি, মাগাযি : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৫। তাবাকাত ইবনে সাদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১।

ও তার মহত্ত্ব, আদেশ-নিষেধের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক—এগুলোই হচ্ছে সত্যবাদী মুজাহিদদের অবশ্য অর্জনীয় গুণ। দ্বীনের পথে মুজাহিদদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন:—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [المائدة: ٥٤]

হে ইমানদারগণ ! তোমাদের মাঝে কেউ যদি তার দ্বীন হতে ফিরে যায়, তবে অচিরে আল্লাহ তাআলা এমন এক জাতি পাঠাবেন, যাদের তিনি পছন্দ করেন, তারাও তাকে পছন্দ করে। যারা মোমিনদের ব্যাপারে হবে বিনম্র, কিন্তু কাফেরদের উপর হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ নিবে, নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না, এ আল্লাহর ফজিলত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।

আর আল্লাহ প্রশস্ত, সর্বজ্ঞ।[1]

একই সাথে, পার্থিব প্রবৃত্তির আস্বাদে যারা বিভোর, ভুলে আছে যারা তাআত ও আনুগত্যের যাবতীয় অনুসঙ্গ, তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :—

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة: ٢٤].

আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তার রাসূল, এবং আল্লাহর পথে জেহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান-সন্ততি,

---

[1] সূরা আল মায়েদা : আয়াত ৫৪।

তোমাদের ভ্রাতা, পত্নী, তোমাদের স্ব-গোষ্ঠী, অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দাকালের আশঙ্কা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ কর, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা অবধি। আল্লাহ ফাসেক কওমকে হেদায়েত করেন না।[1]

রমজানের আমলে আহলে কিতাবিদের সাথে বৈপরিত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের আমলের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবিদের সাথে বৈপরিত্য রেখেছেন। এক হাদিসে এসেছে, রাসূল বলেন :—

لا يزال الدين ظاهراً ما عجَّل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون.

দ্বীন বিজয়ী হবে, যে যাবৎ মানুষ দ্রুত ইফতার করবে। কারণ, ইহুদি-নাসারা তা বিলম্বে করে।[2]

অপর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :—

لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفطرْ. عَجِّلُوا الفطر! فإن اليهود يؤخرون.

যে অবধি মানুষ দ্রুত ইফতার করবে (অর্থাৎ সময় হওয়া মাত্রই), ভাল থাকবে। তোমরা দ্রুত ইফতার কর, কারণ, ইহুদিরা তা বিলম্বে করে।[3]

তিনি আরো এরশাদ করেন :—

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.

আমাদের ও আহলে কিতাবিদের রোজার মাঝে পার্থক্য হল সেহরি গ্রহণ।[1]

---

[1] সূরা তওবা : আয়াত ২৪।

[2] আবু দাউদ : ২৩৫৩, হাদিসটি হাসান।

[3] ইবনে মাজা : ১৬৯৭, হাদিসটি সহি।

ইসলাম ধর্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। তার বৈশিষ্ট্যগুলো পৌত্তলিক ও বিকৃতকারী আহলে কিতাবিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রোজা ইত্যাদি ক্ষেত্রে, তাই, রাসূল ছিলেন পার্থক্য বজায় রাখার নিদর্শন ও নির্দেশক।

উম্মত আজ সাংস্কৃতিক, চেতনাগত এক ব্যাপক দৌর্বল্যে আক্রান্ত, সর্বক্ষেত্রে অন্যের পদাঙ্ক অনুসরণই হয়ে উঠেছে তার একমাত্র ভবিতব্য। কাফের ও পৌত্তলিকদের সাথে বৈসাদৃশ্য গ্রহণ, সন্দেহ নেই, তার জন্য ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। ধর্ম ও ধর্ম-চেতনার যা তাদের জন্য বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা প্রাপ্ত, তাতে নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চিন্তা ও চেতনার মৌলনীতির যা স্তম্ভের স্বীকৃতি প্রাপ্ত, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধের পরিচায়ক, তাই কেবল তাদের হারানো দিনের পুনরূপায়নের চাবিকাঠি হতে পারে, ফিরিয়ে আনতে পারে কাঙ্ক্ষিত বিজয়, আর স্বভূমি উদ্ধারের সুবাতাস।

জীবন সায়াহ্নে আমলের আধিক্য

জীবনের শেষ সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে অধিক আমল করতেন। হাদিসে পাওয়া যায়, রাসূল এ সময়ে এতেকাফে দ্বিগুণ সময় ব্যয় করতেন। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان النبي صلي الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً.

[1] মুসলিম : ১০৯৬।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমজানে দশ দিন এতেকাফে যাপন করতেন, যে বছর তার ঊর্ধ্বারোহন হয়, সে বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফে যাপন করেন।[1]

শেষ সময়ে তিনি দু বার জিবরাইল আ:-এর সাথে কোরআন সহপাঠ ও অনুশীলনে অংশ নেন। রাসূলের প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন : আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে জানালেন যে, জিবরাইল প্রতি বছর আমাকে একবার কোরআন শোনাতেন-শুনতেন, এবার তিনি তা দু বার করেছেন, একে আমি আমার সময় ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিত মনে করছি।[2]

আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে উভয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে—তিনি বলেন:—

كان يعرض على النبي صلي الله عليه و سلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه.

রাসূলকে প্রতি বছর একবার কোরআন পাঠ করে শোনান হত, যে বছর তার ঊর্ধারোহন হয়, সে বছর তাকে দু বার শোনান হয়। প্রতি বছর তিনি দশ দিন এতেকাফ করতেন, যে বছর তার তিরোধান হয়, সে বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ পালন করেন।[3]

আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যে জ্ঞাত হয়েছে, পেয়েছে আপন আত্মার পরিচয়, তার দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, সর্বক্ষেত্রে খালেকের মুখাপেক্ষিতা, উপলব্ধি করতে পেরেছে পার্থিবের ক্ষণস্থায়িত্ব, একে গ্রহণ করেছে পরীক্ষার স্থল হিসেবে এবং পরকালকে ভেবেছে

---

[1] বোখারি : ১৯০৩।

[2] বোখারি : ৩৬২৪।

[3] বোখারি : ৪৯৯৮।

চিরকালীন আবাস, ফলে রাসূলের অনুবর্তন ও কল্যাণ কর্মে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ হয়েছে তার ফলশ্রুতি, উপযোগিতা বিচারে সে গ্রহণ করেছে সময়ের সর্বাধিক কল্যাণকর সিদ্ধান্ত। বিশেষত: জীবনের দীর্ঘ বসন্ত যার অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে, পৌঁছে গেছে পরকালগাহের সন্নিকটে, তার জন্য এ কর্ম পন্থা খুবই সময়োচিত—সন্দেহ নেই।

এই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত-প্রকাশ্য জীবনের ক্ষুদ্র অথচ অনুসরণীয় কয়েকটি নিদর্শন, বরকতময় মহত্তম সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য রাসূল যাকে গ্রহণ করেছেন কর্মপদ্ধতি হিসেবে। এ হচ্ছে আল্লাহর সুদৃঢ় ঋজু পথ আঁকড়ে ধরবার আলোকবর্তিকা, এ পথ বিচ্যুত ব্যক্তি মাত্রই বিভ্রান্ত, অতলান্ত অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত। রাসূল প্রদর্শিত সুন্নতের পথে ফিরে আসা ব্যতীত সে ক্রমাগত ঘুরপাক খাবে পথের বাকচক্রে। হে আল্লাহ ! আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আপনার আনুগত্য করার, রক্ষা করুন আপনার অবাধ্যতা হতে, দৃঢ়-অবিচল রাখুন দ্বীনের উপর ; রাসূলের সর্বাত্মক অনুসরণের সৌভাগ্যে ভূষিত করুন। আমিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমজানে প্রিয় সহধর্মিণীদের সাথে রাসূলের আচরণ

রমজানে প্রিয় সহধর্মিণীদের সাথে রাসূলের আচরণ

সহধর্মিণীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে তার আচরণের অসাধারণ এক ভারসাম্য, জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি যা তিনি বজায় রেখেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। রাসূল নিজ গুণ সম্পর্কে বলেন :—

إنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.

তোমাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম আমি।[1]

ভিন্ন এক হাদিসে তিনি এরশাদ করেন :—

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم.

তোমরা জেনেছ যে, আমি তোমাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহভীরু, সত্যবাদী ও সৎ।[2]

হাদিসে আরো এসেছে—

أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله.

আমি তোমাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ প্রবর্তিত সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞাত।[3] আল্লাহর সাথে রাসূলের আচরণের আলোচনার নানা-পর্বে এ বিষয়ে পাঠককে ধারণা দিতে আমরা প্রয়াস পেয়েছি।

পক্ষান্তরে স্ত্রী ও সহধর্মিণীদের সাথে তার আচরণ কেমন ছিল—সে সম্পর্কে রাসূলের হাদিস :—

---

[1] বোখারি : ২০।

[2] বোখারি : ৭৩৬৭।

[3] আহমদ : ৫/৪৩৪।

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.

তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আমি তোমাদের মাঝে আমার পরিবারের নিকট সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি।[1]—পর্যালোচনা করলেই আমরা জানতে পারব। রাসূল তার স্ত্রীদের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন, বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদে আমরা সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

শিক্ষাদান

রাসূল রমজান মাসে নানাভাবে তার স্ত্রী-গণকে শিক্ষা দান করতেন। হাদিসের পাঠক মাত্রই বিষয়টি স্বীকার করবেন, কারণ, রমজান বিষয়ক অধিকাংশ হাদিস তার স্ত্রী-গণ কর্তৃক বর্ণিত। স্ত্রীদের শিক্ষা ব্যাপারে রাসূলের গুরুত্বারোপের উত্তম প্রমাণ এগুলো। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি হাদিস এ স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, 'হে আল্লাহর রাসূল আপনার কি মত ? আমি যদি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জ্ঞাত হই, তাহলে আমি কি দোয়া পাঠ করব ?'—এ প্রশ্ন করার পর রাসূল তাকে বললেন :—

قولي: اَللّٰهُم إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

তুমি দোয়া করবে 'হে আল্লাহ ! আপনি ক্ষমাশীল সম্মানিত, আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।[2]

জনৈকা নারী আয়েশা রা.-কে প্রশ্ন করল : যে হায়েজা নারী রোজার কাজা করে, সালাতের কাজা করে না, তার কী হুকুম ? তিনি বললেন :

[1] তিরমিজি : ৩৮৯৫।

[2] তিরমিজি : ৩৪৩৫।

আমাদেরও এমন হয়েছিল, আমদেরকে কেবল রোজা কাজা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সালাত কাজা করার হুকুম দেয়া হয়নি।[1]

আয়েশা রা. অপর হাদিসে বর্ণনা করেন : বেলাল রাত থাকতেই আজান দিয়ে দিতেন, রাসূল তাই সকলকে বললেন ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করে যাও, কারণ, ফজর উদয় হওয়া ব্যতীত সে আজান দেয় না।[2]

এ দু প্রকার হাদিস থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রথমত : শরিয়তের সাব্যস্ত নসের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন ও সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ আবশ্যক। এ, সন্দেহ নেই, দ্বীনের খুবই মৌলিক একটি বিষয়, মোমিনদের আবশ্যিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :—

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور: ٥١]

যখন মোমিনদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের উক্তি হয় এই— আমরা শ্রবণ করালাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।[3]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء:٦٥].

কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ ! যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদের বিচারের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ না করে, অত:পর

---

[1] মুসলিম : ৩৩৫।

[2] বোখারি : ১৮১৯।

[3] সূরা নূর : আয়াত ৫১।

আপনার সিদ্ধান্ত বিষয়ে তাদের মনে কোন-রূপ দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মোমিন হবে না।[1]

এ বিষয়টি সাহাবিদের জীবন ও জীবনাচারে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল একবার দেখতে পেলেন জনৈক সাহাবি পাথর ছুঁড়ে মারছে। তিনি বললেন, তুমি পাথর ছুঁড়ে মের না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর ছুঁড়ে মারতে নিষেধ করেছেন, কিংবা তিনি একে অপছন্দ করতেন। কিন্তু এরপরও তিনি দেখতে পেলেন যে, উক্ত সাহাবি পাথর ছুঁড়ে মারছে। তাই তিনি বললেন, আমি তোমাকে হাদিস বর্ণনা করছি যে, রাসূল পাথর ছোঁড়া হতে নিষেধ করেছেন, কিংবা তিনি একে অপছন্দ করেছেন, অথচ তুমি পাথর ছুঁড়ছ! তোমার সাথে এ ব্যাপারে আর কিছুই বলব না।[2] ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বললেন—

تمتع النبي صلي الله عليه و سلم، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلي الله عليه و سلم، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر.

রাসূল তামাত্তু হজ পালন করেছেন। তার বিরোধিতা করে উরওয়া মন্তব্য করেন যে, আবু বকর ও উমর রা. তামাত্তুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। উত্তরে ইবনে আব্বাস বলেন যে, আমি দেখছি তারা ধ্বংস হবে। আমি বলছি রাসূল বলেছেন। আর তারা বলছে যে, আবু বকর ও উমর নিষেধ করেছেন।[3]

দ্বিতীয়ত : ফজরের আজানের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ফজরের উদয় সম্পর্কে সচেতন করা। মুয়াজ্জিনের আজানের সূচনার পর কোনভাবে পানাহার বৈধ নয়, তবে যদি নিশ্চিত হওয়ার যায় যে,

---

[1] সূরা নিসা : আয়াত ৬৫।

[2] বোখারি : ৫১৬২।

[3] ইবনে আব্দুল বার : জামে বায়ানিল ওয়া ফাজলিহি : ২৩৮১।

মুয়াজ্জিন ফজর উদয়ের পূর্বেই আজান দিচ্ছেন, তবে অবৈধ নয়। যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের আজানের মাধ্যমে সচেতন হয় না, তার কথা ভিন্ন ; তার রোজা হবে কি-না সন্দেহ। আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন।

তৃতীয়ত : মাগরিবের ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের পরও আজানে কিছুটা বিলম্ব করার যে রীতি ক্যালেন্ডার ও কোন কোন মুয়াজ্জিনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তার শরয়ি কোন ভিত্তি নেই। এমনিভাবে, সতর্কতা বশত: ফজরে সাদেক উদিত হওয়ার পূর্বেই যে আজান দেওয়া হয়, তারও কোন বৈধতা পাওয়া যায় না। এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন খুবই অসিদ্ধ একটি বিষয়। কারণ, এর ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে অসময়ে সালাত আদায় করে, পানাহার ত্যাগ করে সময় শেষ হওয়ার পূর্বে। নাজাত প্রত্যাশী ব্যক্তি মাত্রই যেন এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যায় সযত্নে। দ্বীনের ক্ষেত্রে এগুলো বাড়াবাড়িতুল্য, রাসূলের স্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে যার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূল এরশাদ করেন—

هلك المتنطعون، قالها ثلاثاً.

অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে—তিনি এটি তিন বার বললেন।[1]

কল্যাণকর ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েতের একমাত্রিক নিদর্শন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত। বেদআত মাত্রই বিভ্রান্তির নামান্তর, যে কোন বিভ্রান্তির অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি জাহান্নাম। রাসূল ও তার সম্মানিত সাহাবিগণ যখন সূর্যাস্তের ব্যাপারে প্রবল ধারণায় উপনীত হতেন—এমনকি, মেঘলা দিনেও, খোঁজ-অনুসন্ধানের বাহুল্য ছাড়াই দ্রুত ইফতার করে নিতেন। আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর হাদিসে পাওয়া যায়, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[1] মুসলিম : ২৬৭০।

ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন একবার মেঘলা দিনে আমরা ইফতার করার পর সূর্যোদয় হল।[1]

তার বর্ণিত অপর এক হাদিসে পাওয়া যায়, তিনি বলেন :—

أن النبي صلي الله عليه و سلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবনে উম্মে মাকতুম রাতে আজান দেয়, সুতরাং তোমরা বেলালের আজান অবধি পানাহার কর। বেলাল রা. ফজর দেখে অত:পর আজান দিতেন।[2]

ভিন্ন এক হাদিসে তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল এরশাদ করেছেন:—

مـــن مـــات وعليه صيام صام عنه وليه.

রোজার দায়িত্ব রেখে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ হতে তার উত্তরাধিকারী রোজা আদায় করে নিবে।[3]

হাফসা রা. বর্ণনা করেন :—

---

[1] বোখারি : ১৮৫৮। ইবনে উসাইমিন : মাজমুউ ফাতাওয়া : খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ২৬৯।

[2] ইবনে হিব্বান : ২৪৭৩, তার সূত্র খুবই শক্তিশালী। প্রসিদ্ধ হল, রাতের অংশে প্রথম আজান ছিল বেলাল রা. প্রদত্ত, উম্মে মাকতুমের নয়। দ্র : মুসলিম : ১০৯২। সুতরাং, এ হাদিসটি এক ধরনের আপাত বিরোধ তৈরি করে। তবে, বিষয়টি তলিয়ে দেখলে এমন মনে হবে না। কারণ, রাসূল তাদের উভয়ের মাঝে আজানের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং, বেলাল রা. কখনো কখনো ফজরের নয়, নিদ্রাগ্রহণকারী ও রাত জাগরণকারীদের সতর্ক করার জন্য আজান দিতেন রাতের অংশে। একে বলা হত প্রথম আজান। এ সময়ে দ্বিতীয় আজান দিতেন উম্মে মাকতুম। কখনো কখনো রাতের অংশের আজান দিতেন উম্মে মাকতুম, বেলাল রা. দিতেন ফজরের আজান। সুতরাং উভয় হাদিসের মাঝে আপাত বিরোধ মনে হলেও মৌলিকভাবে তাতে কোন বিরোধ নেই। সহি ইবনে হিব্বান : খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা : ২৫২-২৫৩।

[3] বোখারি : ১৯৫২।

أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

রাসূল বলেছেন, যে ফজরের পূর্বেই রোজার সূচনা না করে, তার রোজা নেই।[1] বর্তমান সময়ের নারী সমাজের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, তারা নানা রকম মূর্খতা ও বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত, এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে তারা অনবগত, যা কোনভাবেই বরদাশত করা যায় না। যদিও এর দায়-দায়িত্ব পুরোটাই নারীর উপর বর্তে, যেহেতু রাসূল এরশাদ করেছেন :—

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

যে এমন কাজ করবে, যা আমাদের ধর্মে নেই, তা পরিত্যাজ্য।— কিন্তু পরিবারের কর্তাব্যক্তি যে, তার পক্ষে কখনো দায় এড়ানো যাবে না। সন্দেহ নেই, আমানত নষ্ট ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার পুরো দায় চাপবে তার ঘাড়ে। এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য রাসূলের এ উক্তিই যথেষ্ট :—

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته.

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, ব্যক্তি তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।[2]

অপর হাদিসে এসেছে, রাসূল বলেন :—

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.

---

[1] আবু দাউদ : ২৪৫৪, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ৮৫৩।

ব্যক্তির জন্য পাপ হিসেবে এ-ই যথেষ্ট যে, যার ভোরণ-পোষণ তার দায়িত্ব তাকে সে বিনষ্ট করে দেয়।[1]

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের সাথে তুলনা বা বিচার করলে আমাদের পরিবার ও তার ব্যবস্থাপনার দৈন্যের প্রকট রূপ ধরা পড়বে। রাসূলের সাহাবিগণ তাদের নারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। রুবাইয়ি বিনতে মুআউয়িজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আশুরার ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত আনসারদের গ্রামে বার্তা পাঠালেন : যে ব্যক্তি রোজা রেখেছে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে নেয়, আর পানাহার করছে যে, সে যেন পূর্ণ দিবস এভাবেই অতিবাহিত করে। এরপর আল্লাহ চাহে তো নিশ্চয় আমরা রোজা পালন করব, ছোট ছোট শিশুদেরও রোজা রাখতে বলব। তাদের নিয়ে আমরা মসজিদে গমন করব, তাদের হাতে তুলে দেব পশমের খেলনা। খাবারের জন্য কেউ যদি কাঁদে, তবে ইফতারের সময়ে তাদের খেতে দেব।[2]

শিশুদের এই দিকটি সম্পর্কে আমরা খুবই অবহেলা প্রবণ। আমাদের কেউ কেউ বরং, শিশুদের আগ্রহ সত্ত্বেও, তাদের রোজা, রাত-জাগরণ ও এবাদত হতে বিরত রাখে। শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, এ ভয়ে তারা ভীত। তাদেরকে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত রাখার এ হচ্ছে ভুল ও বিভ্রান্তিকর কৌশল। আল্লাহই ভাল জানেন।

রাসূল সম্পর্কে তার সহধর্মিণীদের অবগতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী-গণ হতে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস ও উক্তি থেকে প্রমাণ হয়, তার জীবন-যাপন, আচার-পদ্ধতি ও

---

[1] আহমদ : ৬৪৯৫, হাদিসটি সহি লিগায়রিহ।

[2] মুসলিম : ১১৩৬।

অভ্যাস বিষয়ে তারা ছিলেন পূর্ণ অবগত-সজাগ। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত—

... كان نبي الله صلي الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلي الله عليه و سلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সালাত আদায় করতেন, পছন্দ করতেন তাতেই অতিবাহিত করতে, যখন নিদ্রা প্রবল হত, রাত-জাগরণের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন দিবসে বার রাকাত সালাত আদায় করে নিতেন। আমি রাসূলকে রমজান ব্যতীত এক রাতে[1] পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করতে, কিংবা পূর্ণ রাত্রি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোজায় অতিবাহিত করতে দেখিনি।[2]

তাকে রাসূলের সালাতের ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : রমজান কিংবা অন্য সময়ে তিনি (রাতে) এগারো রাকাতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি (প্রথমে) চার রাকাত আদায় করতেন, তা হত খুবই অতুলনীয় ও দীর্ঘ। অত:পর আদায় করতেন চার রাকাত, সেটিও হত অতুলনীয় ও দীর্ঘ। অত:পর তিন রাকাত আদায় করতেন। আমি (একবার) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি বিতিরের পূর্বে নিদ্রা যাবেন ? তিনি এরশাদ করলেন : হে আয়েশা ! আমার দু-চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু অন্তর থাকে বিনিদ্র।[3]

---

[1] রাসূল জীবিতাবস্থায় পূর্ণ কোরআন সহ রমজান যাপনের সুযোগ তিনি পাননি। তিনি প্রতি বছর রমজান অবধি যা নাজিল হত, তা এবং ইতিপূর্বে যা নাজিল হয়েছে—সবই রমজানের রাতে তেলাওয়াত করতেন।

[2] মুসলি : ৭৪৬।

[3] বোখারি : ২০১৩।

আয়েশা রা. রাসূলের রমজানের কয়েকটি রাতের সালাত সম্পর্কে বলেন :— ...রাসূল নিরলস রাত্রি যাপন করলেন, লোকেরা যার যার অবস্থানে স্থির থাকল, এমনকি ফজর ঘনিয়ে এল।[1]

রাসূলের সাথে তার পুণ্যবতী স্ত্রী-গণের সময় যাপন, জ্ঞানার্জন অত:পর উম্মতকে সে বিষয়ে অবগত করা ছিল রমজান সম্পর্কে রাসূলের হেদায়েত সম্পর্কের জানার অন্যতম মাধ্যম ও উৎস। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان النبي صلي الله عليه و سلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ দশ দিবসে প্রবেশ করতেন, পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, রাত জাগতেন এবং জাগিয়ে তুলতেন পরিবার-পরিজনকে।[2]

আয়েশা ও উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত—

إن كان رسول الله صلي الله عليه و سلم لَيصبح جُنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.

স্বপ্নদোষে নয়, সহবাস জনিত কারণে রাসূল রমজান দিবসের সূচনা করতেন, অত:পর রোজা পালন করতেন।[3]

আয়েশা রা. হতে আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন : রাসূল রোজা অবস্থায় কোন কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। আমি আয়েশাকে বললাম, ফরজ ও নফল রোজায় ? তিনি বললেন : ফরজ ও নফল—সকল ক্ষেত্রেই।[4]

---

[1] আহমদ : ২৬৩০, হাদিসটি সহি লিগায়রিহ।

[2] বোখারি : ২০২৪।

[3] মুসলিম : ১১০৯।

[4] ইবনে হিব্বান : ৩৫৪৫, হাদিসটি সহি।

আত্মিক ও অনুভবীয় প্রাপ্তি ছাড়াও এ হাদিসগুলো জুড়ে আছে নানা কল্যাণ ; পরিবারের জন্য তাতে রয়েছে শিক্ষা ও তরবিয়ত, এবং রাসূলের অনুবর্তন-অনুসরণের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা।

পরিবার-পরিজনকে দূরে রেখে, সমাজ থেকে বিলগ্ন হয়ে যারা যাপন করছে দাওয়াতি ও ইলমি জীবন, এ হাদিসগুলোর আলোকে তাদের পরিণতি সহজেই অনুমেয়। আল্লাহর কাছে আমরা কায়মনোবাক্যে সঠিক পথের দিশা প্রার্থনা করি।

কল্যাণ কর্মে উৎসাহ প্রদান

'হিস' বা উৎসাহ হচ্ছে প্রতিদান ও ফলাফল বিষয়ে উদ্দীপনা ও প্রেরণ প্রদান করা, শিক্ষার পাশাপাশি এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসূল তার পরিবারকে রমজানের শেষ দশ দিনে রাতে জাগিয়ে দিতেন।[1] রাসূল তার পরিবারকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করতেন, এ হাদিসটি থেকে তা প্রমাণিত হয়, কারণ, তিনি এ সময়ে গৃহে অবস্থান করতেন না, মসজিদে এতেকাফরত থাকতেন।

আয়েশা রা. বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিন অনেককে সাথে নিয়ে যাপন করতেন। বলতেন : রমজানের শেষ দশ দিনে তোমরা কদরের রাত অনুসন্ধান কর।[2]

আবু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ...অত:পর মাসের তিন দিন অবশিষ্ট অবধি তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তার পরিবার ও স্ত্রী-গণকে আহ্বান করলেন, এতটা দীর্ঘ সময় তিনি জাগরণ

---

[1] তিরমিজি : ৭৯৫।

[2] বোখারি : ২০২০।

করলেন যে, আমরা সেহরি পরিত্যাগের আশঙ্কা করলাম।[1] অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : চার দিন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্তও তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রি যাপন করলেন না। অত:পর যখন অবশিষ্ট ছিল মাত্র তিন দিন, তখন তিনি তার কন্যা ও স্ত্রীদের নিকট সংবাদ পাঠালেন, এবং লোকেরা জমায়েত হল। তিনি আমাদের নিয়ে এতটা সময় জাগরণ করলেন যে, সেহরি ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হল।[2]

জয়নব বিনতে উম্মে সালামা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন মাসের মাত্র দশ দিন অবশিষ্ট থাকত, তখন পরিবারের সক্ষম সকলকে রাসূল রাত্রি জাগরণ করাতেন।[3]

তারাবীহের জামাতে নারীদের অংশ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে হাদিসগুলো স্পষ্ট প্রমাণ ; তবে 'তাদের গৃহই তাদের জন্য উত্তম'।[4]

গৃহে যে নারী সালাত আদায়ে পূর্ণ মনোযোগি নয়, তার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, অনৈতিকতা ও ফেতনা আশঙ্কা না হলে, নারী যদি শালীনভাবে, উগ্রতা পরিহার করে পর্দা আবৃত হয়ে গমন করে, তবে, এ ক্ষেত্রে নারীর অভিভাবক তাতে বাধা প্রদান করতে পারবে না। রাসূলের হাদিসে এসেছে :—

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

নারীদের মসজিদ গমনে বাধা প্রদান কর না।[5]

উমর রা. অতুলনীয় পদ্ধতিতে আল্লাহর বিধান পালনে প্রয়াস চালিয়েছেন। ইবনে উমর বর্ণনা করেন : উমর রা.-এর কালে এক নারী এশা ও ফজরের সালাত মসজিদে এসে জামাতের সাথে আদায়

---

[1] তিরমিজি : ৮০৬, হাদিসটি সহি।

[2] নাসায়ি ১৩৬৪, হাদিসটি সহি।

[3] মারওয়াজি : কিয়ামু রমজান : ৩১।

[4] আবু দাউদ : ৫৬৭, হাদিসটি সহি।

[5] বোখারি : ৮৫৮।

করত। তাকে বলা হল : উমরের অপছন্দ ও মর্যাদাহানীকর মনে করা সত্ত্বেও কেন তুমি বের হও ? নারী বলল : সে আমাকে বাধা দিচ্ছে না কেন ? লোকটি বলল : কেননা, রাসূলের স্পষ্ট হাদিস আছে যে : তোমরা নারীদের মসজিদে গমনে বাধা প্রদান কর না।[1]

স্ত্রীদের সাথে রাসূলের আচরণ, তাদের শিক্ষা, নসিহত ও উপদেশ দান দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—ইত্যাদি হাদিসের মাধ্যমে তার অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের হিকমত আমরা অনুধাবন করতে পারি। অন্যান্য ক্ষেত্রে উম্মতকে দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি নারীদের সাথে ব্যবহার, আচার-পদ্ধতি, দিক নির্দেশনা প্রদানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল যদি তাদের ব্যাপারে এমন ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান না করতেন, তবে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে নারীগণ কখনোই অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন না।

রাসূলের সাথে এতেকাফ যাপনে অনুমতি প্রদান

রাসূল তার স্ত্রী-গণকে তার সাথে এতেকাফ পালনের অনুমতি প্রদান করতেন। আয়েশা রা. বর্ণিত আছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশ দিনে এতেকাফের উল্লেখ করলেন, আয়েশা অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসা আয়েশা রা.-কে তার জন্য অনুমতির কথা বললে তিনি অনুমতি নিলেন... ।[2]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে : আমি তার কাছে অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দিলেন। হাফসাও অনুমতি প্রার্থনা করল, তিনি তাকেও অনুমতি দিলেন।[3]

---

[1] আবু দাউদ : ৫৬৭, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ২০৪৫।

[3] আব্দুর রাজ্জাক : ৮০৩১, হাদিসটি সহি।

অনুমতি গ্রহণের এই পর্ব হতে দায়বদ্ধতার বিষয়টি প্রবলভাবে ধরা পড়ে। মুসলিম পরিবার ও তার কাঠামো এ দায়বদ্ধতা ও অনুমতি গ্রহণের নীতির উপর অনেকটাই নির্ভর করে, এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সম্মান, স্থিরতা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

এতেকাফের ক্ষেত্রে উম্মাহাতুল মোমিনীনদের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ হয়, এতেকাফ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নারীদের জন্যও বৈধ। নারীদের জন্য শর্ত হচ্ছে অভিভাবকের অনুমতি লাভ—হাদিস থেকে যেমন প্রমাণ হয়। নারীদের এতেকাফের পরিবেশ হতে হবে ফেতনার যাবতীয় সম্ভাবনা হতে মুক্ত, পর পুরুষের সংস্পর্শ হতে নিরাপদ। কারণ, কল্যাণ আনয়নের পূর্বে মন্দের অপনয়ন আবশ্যক।[1]

রাসূলের সাথে সম্মিলিত এবাদত পালন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মিলিতভাবে তার স্ত্রী-গণের সাথে এবাদত পালন করতেন। রমজানের কিছু কিছু রাতে তার সাথে স্ত্রী-গণ জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আবু যর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ...অত:পর তিনি মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না, তৃতীয় দিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। ডেকে নিলেন তার পরিবার ও স্ত্রী-গণকে। এত দীর্ঘ সময় আমাদের নিয়ে রাত্রি জাগরণ করলেন যে, আমাদের ভয় হল সেহরির সময় অতিক্রান্তের।[2]

রাসূলের স্ত্রী-গণ তার সাথে এতেকাফ পালন করতেন। আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূলের সাথে তার একজন স্ত্রী হায়েজা

---

[1] আলবানি, কেয়ামু রমজান : ২৯।

[2] তিরমিজি : ৮০৬, হাদিসটি সহি।

অবস্থায় এতেকাফ পালন করল, সে স্রাব দেখতে পাচ্ছিল, এবং নিম্নদেশে একটি পাত্র রেখে দিল।[1]

রাসূল যদি গভীরভাবে তার স্ত্রী-গণের প্রতি লক্ষ্য না রাখতেন, প্রচেষ্টা না করতেন তাদের পরকালীন মুক্তির, তবে এবাদত ও কল্যাণের ক্ষেত্রে এ পারস্পরিক সম্মিলন কখনো সম্ভব হত না। এবাদতে রাসূলের সাথে তাদের এ অংশগ্রহণ কোন অর্থেই প্রতিযোগিতামূলক ছিল না, বরং, তার ভিত্তির পুরোটাই গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত আগ্রহকে কেন্দ্র করে। নারীর সম্ভাবনা, প্রকৃতিভেদ, একে অপরের সাথে স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগত মৌলিক পার্থক্য—ইত্যাদির সফল উন্মোচন পাওয়া যায় এতে।

এ কারণেই, উদাহরণত:, আমরা দেখতে পাই রাসূলের অধিকাংশ স্ত্রীই তার সাথে এতেকাফ পালন করেননি, সাফিয়া বর্ণিত হাদিসে আছে : রাসূল মসজিদে অবস্থান করছিলেন, তার স্ত্রী-গণ তার সংসর্গে আনন্দ যাপন করছিল, তিনি সাফিয়া বিনতে হাই-কে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি তাড়াহুড়ো কর না, আমি তোমার সাথে বেরুব।[2]

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল এতেকাফের ইচ্ছা পোষণ করলেন। যে স্থানে এতেকাফের ইচ্ছা করেছিলেন, তথায় পৌঁছে অনেকগুলো তাঁবু দেখতে পেলেন : আয়েশা, হাফসা ও জয়নবের তাঁবু। তিনি বললেন : (সাহাবিদের উদ্দেশ্যে) তোমরা কি একে নারীদের জন্য পুণ্যের কাজ মনে কর ? অত:পর তিনি এতেকাফ পালন না করেই প্রস্থান করলেন। পরবর্তীতে শাওয়ালের দশ দিন তিনি এতেকাফে (কাজা স্বরূপ) অতিবাহিত করেছিলেন।[3]

দেখা যাচ্ছে, মাত্র তিন জন স্ত্রী তথায় তাঁবু টানিয়ে ছিলেন। অথচ, রাসূলের তিরোধানের পর তার সকল স্ত্রীই এতেকাফ পালন করেছেন।

---

[1] বোখারি : ৩০৯।

[2] বোখারি : ২০৩৮।

[3] বোখারি : ২০৩৪।

আয়েশা রা. বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পর্যন্ত রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ পালন করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী-গণ এতেকাফ পালন করেছেন।[1]

এগুলো প্রমাণ করে, পরিবারের যে কর্তা ও অভিভাবক, তার দায়িত্ব পরিবার-ভুক্ত সকলের আগ্রহ ও প্রবণতাকে শনাক্ত করা। তাদের কেউ হয়তো সালাতে অধিক আগ্রহী, কারো আকর্ষণ এতেকাফে, অপর কেউ হয়তো কোরআন তেলাওয়াত ও জিকিরে মগ্নতাই অধিক পছন্দ করে, কেউ কেউ নিজেকে পরিব্যাপ্ত রাখে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানার্জন ও দাওয়াতে। নারীর এ প্রবণতা ও আগ্রহের কেন্দ্রগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম না হলে, তার মাধ্যমে এবাদত ও সম্ভাবনার উন্মেষ কোনভাবেই সম্ভব হবে না।

স্ত্রী-গণের সাথে রাসূলের বান্ধব সুলভ আচরণ ও সম্পর্ক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী-গণের সাথে খুবই বান্ধব সুলভ আচরণ করতেন, অভ্যাস-আচরণের এ বৈশিষ্ট্য আজীবন তিনি বজায় রেখেছেন। রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত করে এ বৈশিষ্ট্যের যে কয়টি হাদিস ও বর্ণনা পাওয়া যায়, তার উদাহরণ নিম্নরূপ :—

রাসূল তাদের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন, সচেষ্ট থাকতেন পরিবারের ভিতকে দৃঢ় রাখতে ; তিনি পরিবারকে পরিচালনা করতেন এমন এক আবহে, যা হত লোক-দেখানো চাকচিক্য, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও রিয়া হতে মুক্ত। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী-গণের মাঝে ন্যূনতম অহংকার সৃষ্টির ভয়ে এতেকাফ বর্জন করেছিলেন।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত : তিনি বলেন,

---

[1] বোখারি : ২০২৬।

كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء؛ فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر؛ فلما أصبح النبي صلى الله عليه و سلم رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأُخْبِر فقال النبي صلى الله عليه و سلم: آلبر تُرَوْنَ بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال.

রাসূল রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ পালন করতেন। আমি তার জন্য একটি তাঁবু টানালাম, তিনি ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করলেন। হাফসা তাঁবু টানানোর জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন, এবং হাফসা আরেকটি তাঁবু টানালেন। জয়নব বিনতে জাহাশ দেখতে পেয়ে তার নিজের জন্য আরেকটি তাঁবু টানালেন। সকালে রাসূল অনেকগুলো তাঁবু দেখে বললেন : এগুলো কি ? তাকে বলা হলে তিনি এরশাদ করলেন : তোমরা (সাহাবিদের উদ্দেশ্যে) কি একে পুণ্যের মনে কর ? সে মাসে তিনি এতেকাফ পরিত্যাগ করলেন, অত:পর (কাজা স্বরূপ) শাওয়ালের দশ দিন এতেকাফ করলেন।[1]

ইবনে হাজার রহ. বলেন : রাসূল হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাদের এবাদত হবে রাসূলের দৃষ্টি ও ভালোবাসা লাভের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং অহংকারের কারণে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়। ফলে এতেকাফ তার মৌলিকত্ব হারাবে। এ কারণেই তিনি তথা হতে প্রস্থান করেছিলেন।[2]

আল্লামা বাজি বলেন : হয়তো রাসূল তাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করাতে চেয়েছিলেন, বিধায় নিজেই প্রস্থান করেছেন। তার প্রস্থানকেই

---

[1] বোখারি : ২০৩৩।

[2] ইবনে হাজার : ফতহুল বারি : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২৪।

সকলের জন্য কল্যাণকর, শিক্ষণীয় ও সন্তুষ্টির কারণ মনে করেছিলেন। মোমিনদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দয়ার্দ্র।[1]

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মহান (!) ব্যক্তিবর্গ, বিশেষভাবে রমজান মাসে উমরা, রাত্রি জাগরণ, ও এতেকাফ ইত্যাদি এবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, অথচ পরিবার-পরিজনকে রেখে আসেন সম্পূর্ণ অরক্ষিতে। এ ব্যাপারে রাসূলই আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ, মোস্তাহাব এবাদত পরিত্যাগ করে তিনি পরিবারের প্রতি মনোযোগ দেয়াকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

রমজানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি এতেকাফ সত্ত্বেও, আপন বেশ-ভূষা ও দেহে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পছন্দ করতেন। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :—

كان النبي صلي الله عليه و سلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফকালীন আমার নিকট মস্তক এগিয়ে দিতেন, আমি তার কেশবিন্যাস করে দিতাম, মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন না।[2]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে : এতেকাফকালীন তিনি তার মস্তক আমার নিকট এগিয়ে দিতেন, আমি হায়েজা অবস্থাতেও তা ধৌত করে দিতাম।[3] স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ও প্রীতির এর চেয়ে উত্তম নিদর্শন রয়েছে বলে আমি অবগত নই।

রোজা অবস্থাতেও রাসূল তার স্ত্রী-গণকে চুম্বন করতেন, মেলামেশা করতেন ঘনিষ্ঠভাবে। উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা.-এর

---

[1] বাজি : আল মুনতাকা : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৩।

[2] মুসলিম : ২৯৭।

[3] বোখারি : ৩০১।

হাদিসে আছে—রমজান মাসেও রাসূল চুম্বন করতেন।[1] অপর রেওয়ায়েতে আছে : রাসূল রমজানে রোজা রেখে চুম্বন করতেন।[2] ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে এসেছে, আয়েশা রা. বলেন : রাসূল চুম্বনের জন্য আমার নিকট ঝুঁকে এলেন, আমি বললাম : আমি তো রোজাদার ! তিনি বললেন, আমিও রোজাদার। আয়েশা বলেন : অত:পর তিনি ঝুঁকে এসে আমাকে চুম্বন করলেন।[3]

হাফসা রা. বলেন : রাসূল রোজা রাখা অবস্থায় চুম্বন করতেন।[4]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রেখেই তার কোন কোন স্ত্রীর মুখমণ্ডলে চুম্বন করতেন।[5]

উম্মে হাবিবা হতে বর্ণিত, রাসূল রোজা রেখেই চুম্বন করতেন।[6]

ঘনিষ্ঠ মেলামেশার প্রমাণ স্বরূপ আয়েশা রা, বর্ণিত হাদিস : তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে আমি তাকে বললাম, আমি তো রোজাদার ! তিনি বললেন : আমিও রোজাদার।[7] রোজা অবস্থায় মেলামেশা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আয়েশা রা. মাসরুক ও আসওয়াদকে জানান : হ্যা, (তিনি মেলামেশা করতেন) কিন্তু তিনি ছিলেন তোমাদের মাঝে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণশীল।[8]

এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে চুম্বন ও মেলামেশার ক্ষেত্রে সকল রোজাদারই সমকাতারভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি রাসূলের অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ

---

[1] মুসলিম : ১১০৬।

[2] মুসলিম : ১১০৬।

[3] আহমদ : ২৫০২২, সূত্রটি শুদ্ধ।

[4] মুসলিম : ১১০৭।

[5] আহমদ : ২৬৪৪৫।

[6] আহমদ : ২৬৭৬২।

[7] আহমদ : ২৫২৯০।

[8] মুসলিম : ১১০৬।

করতে সক্ষম, তার জন্য বৈধ, অন্যথায় বীর্যপাত কিংবা সংগমের অবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে রোজা বিনষ্ট হওয়ার, তার জন্য চুম্বন বা ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বৈধ নয়। আমলের ক্ষেত্রে মৌলনীতি হচ্ছে, যা ওয়াজিব পূর্ণ করার অবলম্বন, তাকে রক্ষা করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে যে মাঝামাঝি প্রকৃতির, তার জন্য মাকরূহ।

আয়েশা হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল রোজা রেখে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতেন।[1] ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে আছে—রাসূল রোজা অবস্থায় ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতেন, অত:পর উভয় অঙ্গের মাঝে একটি কাপড় স্থাপন করে দিতেন।[2]

চুম্বন, আলিঙ্গন ও প্রীতি প্রকাশের নির্দোষ বিষয়গুলোকে রোজা বাধা প্রদান করবে না। তবে, শর্ত হচ্ছে একে একটি নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, শরিয়তের অবশ্য বিধান লঙ্ঘন করা যাবে না।

তবে, যারা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে আছে যে, পার্থিব অর্জনের নিমিত্তে ভুলে বসেছে পরকালের অর্জন ও সাফল্য। পরিবারকে ব্যস্ত রাখছে ইহকালীন নানা ঘটনায়, সুযোগ তৈরি করছে না এবাদত, আনুগত্য ও সওয়াবের কাজের—তাদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ ও আতঙ্ককর। আল্লাহ তাআলা বান্দার এ প্রবণতার ফলে পরিবার-পরিজনকে শত্রু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কোরআনে এসেছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. [التغابن: ١٤]

[1] মুসলিম : ১১০৬।

[2] আহমদ : ২৪৩১৪, হাদিসটি সহি।

হে ইমানদারগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে রয়েছে তোমাদের শত্রু। সুতরাং, তাদের ভয় কর।[1] অর্থাৎ, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে, তা শত্রুতার, সুতরাং... ।

রমজানের প্রথম বিশ দিনে রাসূল স্ত্রীদের সাথে সহবাসে মিলিত হতেন, তবে শেষ দশ দিনে এতেকাফকালীন তা হতে বিরত থাকতেন, ব্যস্ত থাকতেন নির্জন এবাদতে। রাসূলের এ আচরণ প্রমাণ করে, অধিক-হারে এবাদত সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের হক আদায়ে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

রাসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : স্বপ্নদোষে নয়, (সহবাসের কারণে) রমজানে অপবিত্র অবস্থায় রাসূলের ফজর হয়ে যেত। অত:পর তিনি গোসল করে রোজা পালন করতেন।[2]

উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত অন্য রেওয়ায়েতে আছে :—স্ত্রী সহবাসের ফলে অপবিত্র অবস্থাতেও রাসূলের ফজর হয়ে যেত। অত:পর তিনি গোসল করে রোজা পালন করতেন।[3]

ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে : স্বপ্নদোষের কারণে নয়, রাসূল অবশ্যই রমজানে সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন, অত:পর রোজা রাখতেন।[4]

তবে, রাসূল কেবল রমজানের প্রথম বিশ দিনে স্ত্রী সহবাস করতেন, শেষ দশ দিনে তিনি এতেকাফ পালন করতেন। আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

كان النبي صلي الله عليه و سلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

[1] সূরা তাগাবুন : আয়াত : ১৪।

[2] মুসিলম : ১১০৯।

[3] বোখারি : ১৯২৬।

[4] মুসলিম : ১১০৯।

শেষ দশ দিনে রাসূল স্ত্রী সহবাস বর্জন করতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন, এবং জাগিয়ে দিতেন পরিবারকে।[1]

ইবনে হাজার شد المئزر -কে ব্যাখ্যা করেছেন স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ অর্থে।[2]

ইমাম বাইহাকি বর্ণিত একটি হাদিসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, বর্জন করতেন স্ত্রী সহবাস।[3] সালাত আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, ধ্যান, আত্মিক ও মৌখিক জিকির—ইত্যাদির মাধ্যমে রাতকে এবাদত-শোভিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

এ হচ্ছে রাসূলের খুবই ভারসাম্যপূর্ণ গুণ। উল্লেখিত হাদিসগুলোতে রাসূলের কর্ম দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়, আবু দারদা বর্ণিত একটি হাদিসে মৌখিক স্বীকৃতি পাওয়া যায়, সালমান ফারসির এক উক্তি শ্রবণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন, বলেছেন : সালমান সত্য বলেছে। সালমান রা.-এর উক্ত উক্তি ছিল : তোমার উপর হক রয়েছে তোমার রবের, তোমার আত্মার এবং তোমার পরিবারের ; সুতরাং, তুমি প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও।[4]

এতেকাফগাহে রাসূলের সাথে তার স্ত্রী-গণের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

---

[1] বোখারি : ২০২৪।

[2] ফতহুল বারি : ইবনে হাজার : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৬।

[3] বাইহাকি : আস সুনানুল কুবরা : খণ্ড : ৪, পষ্ঠা : ৩১৪।

[4] বোখারি : ৬১৩৯।

সাফিয়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি রমজানের শেষ দশ দিনে রাসূলের মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে এলেন, তিনি কিছু সময় তথায় অবস্থান করে কথা বললেন, অত:পর উঠে প্রস্থান করলেন।[1]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে : রাসূল মসজিদে ছিলেন, তার স্ত্রী-গণ আনন্দে তার সংসর্গ যাপন করছিলেন। সাফিয়া বিনতে হাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তুমি তাড়াহুড়ো কর না... ।[2]

এতেকাফের কারণে পরিবারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক নয়, এতেকাফরত অবস্থায়ও মানুষ তার পরিবারকে সময় দিতে পারে, লক্ষ্য রাখতে পারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি।

রাসূল রোজা রেখে, এতেকাফে থেকেও স্ত্রীদের প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাফিয়া বর্ণিত হাদিসে—তাতে আছে : তিনি রমজানের শেষ দশ দিনে মসজিদে এতেকাফরত রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন, কিছুটা সময় তথায় যাপন করে অত:পর প্রস্থানোদ্যত হলেন, রাসূলও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য এগিয়ে এলেন।[3]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে : রাসূল মসজিদে অবস্থান করছিলেন, তার স্ত্রী-গণ তাকে ঘিরে আনন্দ উদযাপন করছিলেন। সাফিয়াকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন : তাড়াহুড়ো কর না, আমি তোমার সাথে বেরুব। তার আবাস ছিল উসামার বাড়িতে, (রাসূল পৌঁছে দেয়ার জন্য) বেরিয়ে এলেন।[4]

---

[1] বোখারি : ৬২১৯।
[2] বোখারি : ২০৩৮।
[3] বোখারি : ২০৩৫।
[4] বোখারি : ২০৩৮।

একই হাদিস ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে এভাবে : এতেকাফরত অবস্থায় রাসূলের সাথে সাফিয়া সাক্ষাৎ করতে এলেন। প্রস্থানকালে তিনি তার সাথে এগিয়ে গেলেন।[1]

যারা এবাদতের নামে পরিবাব-পরিজন ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে সমাজের অন্ধকার কোণে,—যদিও আল্লাহর রহমতে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য—কিংবা পরিবার যে অভিভাবকের কাছ থেকে মন্দ ও রুক্ষ স্বভাবই পেয়েছে কেবল, বঞ্চিত হয়েছে তার সময়, গুরুত্ব ও ভাবনা হতে, রাসূলের প্রদর্শিত পথ ও শিষ্টাচার হতে তারা সতত বিক্ষিপ্ত ; রাসূল মানব জাতির জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছেন সর্বোত্তম ও উন্নত আদর্শ। রাসূলের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে মানব মুক্তির সনদ।

রাসূলের উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীদের সেবার্ঘ্য

পুরুষের নিকটতম সঙ্গী হচ্ছে তার স্ত্রী, পুরুষের একান্ত বিষয়গুলো স্ত্রীর দায়িত্বে অর্পণ জন্ম দেয় সুন্দর সম্প্রীতি, প্রেম ও অগাধ ভালোবাসা। রমজান ও অন্যান্য সময়ে রাসূলের জীবনাচার থেকে এমনই চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে।

এতেকাফরত অবস্থাতে রাসূলের স্ত্রী-গণ তার মস্তক ধৌত করে দিতেন, করে দিতেন তার কেশবিন্যাস।

হিশাম বিন ওরওয়া হতে বর্ণিত, তাকে প্রশ্ন করা হল : হায়েজা কিংবা অপবিত্র অবস্থায় নারী কি আমার সেবা অথবা নিকটবর্তী হতে পারবে ? তিনি বললেন : এ সবই আমার কাছে অত্যন্ত সহজ। সব অবস্থাতেই নারী আমার সেবা করে। এ ব্যাপারে কারো উপর কোন বিধি-নিষেধ নেই। আয়েশা রা. আমাকে জানিয়েছেন, রাসূল মসজিদে এতেকাফকালীন তিনি রাসূলের মস্তকের কেশবিন্যাস করে দিতেন।

[1] বোখারি : ২০৩৯।

রাসূল তার মস্তক গৃহে অবস্থানরতা আয়েশার নিকট বাড়িয়ে দিতেন, হায়েজা অবস্থাতেই তিনি তার কেশবিন্যাস করে দিতেন।[1]

আসওয়াদ আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেন : এতেকাফরত অবস্থাতে রাসূল তার মস্তক বাড়িয়ে দিতেন, হায়েজা অবস্থাতে আমি তার মাথা ধৌত করে দিতাম।[2]

এতেকাফের সময় হলে স্ত্রী-গণ তার জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। আয়েশা রা.-এর হাদিসে এসেছে—রমজানের শেষ দশ দিনে তিনি মসজিদে এতেকাফ করতেন, আমি তার জন্য তাঁবু টানিয়ে ছিলাম, রাসূল ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করলেন।[3]

সালাতের জন্য তার স্ত্রী-গণ চাটাই বিছিয়ে দিতেন, এবং গুটিয়ে নিতেন সালাত শেষে। আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—রমজানে লোকেরা দলে দলে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করত। রাসূল আমাকে নির্দেশ করলে আমি তার জন্য চাটাই বিছিয়ে দিলাম।[4]

ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে—

فأمرني رسول الله صلى الله و عليه و سلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيراً على باب حجرتي -إلى أن قال:- اطوِ عنَّا حصيرك يا عائشة...

তখনকার এক রাতে রাসূল আমাকে আমার গৃহের দরজায় একটি চাটাই টানিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। ...অত:পর বললেন : হে আয়েশা, তোমার চাটাই গুটিয়ে নাও।[5]

রাসূলের স্ত্রী-গণ তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন। আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

---

[1] বেখারি : ২৯৬।

[2] বোখারি : ২০৩১।

[3] বোখারি : ২০৩৩।

[4] আবু দাউদ : ১৩৭৪।

[5] আহমদ : ২৬৩০৭।

أن رسول الله صلى الله و عليه و سلم قال: أُريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر.

আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হল, অত:পর আমার একজন স্ত্রী আমাকে জাগিয়ে তুললে আমি তা বিস্মৃত হলাম। সুতরাং, তোমরা তা শেষ দশ দিনে তালাশ কর।[1]

বর্তমান যুগের নারীরা রাসূলের সহধর্মিণীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। উলঙ্গপনা ও সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার এই পতনের যুগে, আমরা দেখতে পাই, নারীগণ তাদের স্বামীদের প্রতি বিন্দুমাত্র দায় বোধ করে না, সবকিছুতেই থাকে তাদের বঞ্চনার অভিযোগ। 'মহান যে কোন পুরুষের আড়ালে আছে মহান কোন নারীর হাত'—এ উক্তি সত্যিই যথার্থ। নারী পুরুষকে জোগায় শক্তি ও সাহস, প্রেরণা দেয় আড়াল থেকে, সৌভাগ্য ও সাফল্যে উদ্দীপিত করে চূড়ান্তভাবে। সততা, সত্যবাদিতা এবং কল্যাণ কর্মের জন্য প্রয়োজন মানসিক স্থিরতা, পারিবারিক স্থিতিশীলতা—একজন নারী যা সফল ভাবে পুরুষের মাঝে সঞ্চার করতে সক্ষম।

রমজানে রাসূলের বিবাহ

জয়নব বিনতে খুযাইমার জীবনালেখ্য উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে সাদ বলেন : হিজরি একত্রিশতম মাসে রাসূলের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।[2] আল্লামা তাবারি বলেন : চতুর্থ হিজরিতে রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মাসাকিন জয়নব বিনতে খুযাইমার সাথে ঘর বাঁধেন ও বাসর যাপন করেন।[3]

[1] মুসলিম : ১১৬৬।
[2] ইবনে সাদ : তাবাকাত : খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১৫।
[3] তাবারির ইতিহাস : খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫৪৫।

ইবনুল আম্মাদ বলেন : হিজরি তৃতীয় বর্ষের রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাক্রমে উম্মুল মোমিনীন হাফসা, জয়নব বিনতে জাহাশ এবং জয়নব বিনতে খুযাইমা রা.-র সাথে বাসর যাপন করেন।[1]

নবুয়্যতি ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার এ হচ্ছে এক উত্তম ও অনুসরণীয় উদাহরণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা মানব জাতির সামনে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে হাজির করেছেন। রাসূল তার জীবনাচারে বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন, সে অনুসারেই আচার পদ্ধতি সাজিয়েছেন, বর্জন করেছেন লোক-দেখানো, ঠুনকো যুহুদের প্রকাশ—যা একই সাথে প্রকৃতি, স্বভাব ও ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গতার নীতি ও বৈশিষ্ট্য বিরোধী।

ব্যাপকভাবে পরিবারের কর্তাব্যক্তি ও বিশেষভাবে দায়িদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কর্তব্য : পরিবার-পরিজনকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, উদ্বুদ্ধ করা তাদেরকে ইলম ও আমলের যাবতীয় অনুষঙ্গে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

আপনি আপনার নিকটবর্তী পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করুন।[2]

পরিবারের ভরন-পোষণই যদি হয় ব্যক্তির জন্য পরিণাম বিচারে প্রদত্ত সর্বোত্তম সদকা, তবে, শিক্ষা-দীক্ষা, উত্তম ব্যবহার ও আচরণ—সন্দেহ নেই, তার জন্য বয়ে আনবে সদকার তুলনায় অধিক পরকালীন সওয়াব ও প্রতিফল। 'সূচনা হোক তোমার পরিবার থেকে', 'প্রথমে পরিবার'—এ বিশ্বাস ও ধারণাগুলো আবার জাগিয়ে তুলতে হবে,

---

[1] ইবনে আম্মাদ : সাযারাতুয যাহাব : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে হিজরি একত্রিশতম মাস শাবানে হাফসার সাথে রাসূল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

[2] সূরা শুআরা : আয়াত ২১৪।

সচেতন করতে হবে সকলকে এ বিষয়ে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দিতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ স্থিতিশীল নববী আদর্শের বিস্তার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রমজানে উম্মতের সাথে রাসূলের আচরণ

রমজানে উম্মতের সাথে রাসূলের আচরণ

বছরের পুরোটা সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের সাথে যেভাবে কাটাতেন, রমজানে তার ব্যত্যয় হত না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে রাসূলের মৌলিক প্রবণতা ও দায়িত্ব-কর্ম সম্পর্কে যা এরশাদ করেছেন, তাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান, একান্ত সাধনা। কোরআনে এসেছে—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .الجمعة: ٢

তিনিই সে সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন, পবিত্র করবেন তাদের, শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত—যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।[1]

অপর এক স্থানে রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :—

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ . التوبة: ١٢٨.

অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল আগমন করেছেন, যা তোমাদের বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র, করুণাময়।[2] তবে, বরকতময় রমজান মাসে তিনি উম্মতের প্রতি, তাদের আমল ও পরকালীন উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন, তাদের উৎসাহিত উদ্দীপ্ত করতেন কল্যাণ-কর্মে।

---

[1] সূরা জুমআ : আয়াত : ২।

[2] সূরা তওবা : আয়াত ১২৮।

রাসূলের সিরাত ও জীবনাচারের যে কোন মগ্ন পাঠকই দেখতে পাবেন, এ বরকতময় মাসে তিনি তার সাহাবিদের নিয়ে বিভিন্ন অবস্থা ও আমলের নতুন নতুন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাপন করেছেন। আত্মশুদ্ধি ও পৃষ্ঠপোষণের এক মূর্ত পরিবেশ বিরাজ করত তার মাঝে, ভরে উঠত তার চার পাশ করুণা ও রহমতের বিচ্ছুরণে, উম্মতের জন্য তিনি হয়ে উঠতেন দয়া ও সহিষ্ণুতার অনুপম প্রতীক। পার্থিব বিষয়ে সৌভাগ্য ও দৃঢ়তা আনয়ন এবং পরকালের সাক্ষাৎ দিবসে নাজাত লাভই ছিল তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

সাহাবিদের তালিম দান

সাহাবিদের তালিম-তরবিয়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে প্রমাণের দ্বারস্থ হওয়া এক প্রকার বাতুলতা। কারণ, তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মৌলিক দায়িত্বই ছিল সাহাবিদের তালিমকে কেন্দ্র করে।

সামুরা বিন জুন্দুব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

لا يغرَّنَّ أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير

সেহরির জন্য বেলালের আজান এবং পূর্ণ বিকশিত ও ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এ ফর্সা আলো যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে।[1]

উমর বিন খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সা. বলেছেন—

إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.

[1] মুসলিম : ১০৯৪।

রাত্রি যখন এ-স্থলে এগিয়ে যাবে, দিবস সরে যখন হটে যাবে এখান থেকে এখানে, সূর্য অস্তমিত হবে, তখন রোজাদার ইফতার করবে।[1]

এ জাতীয় হাদিস ও কোরআনের এ উক্তি—

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ [البقرة: ١٨٧]

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণ-রেখা হতে উষার শুভ্র-রেখা প্রতিভাত হয়। অত:পর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর।[2]

—প্রমাণ করে, রোজার সময়ের সূচনা ফজরের উদয় হতে, এবং তার বিস্তৃতি সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। রোজাদার পূর্ণ দিবস পানাহার হতে বিরত থাকবে। দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত—দিবসের বিস্তৃতি যতক্ষণ প্রচলিত সময় অনুসারে ২৪ ঘন্টায় সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ রোজাদারকে এ সময়টুকু পানাহার হতে বিরত থেকে রোজা রাখার যাবতীয় বিধি ও নিয়ম পালন করতে হবে। তবে, যে সকল স্থানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দিবস ও রাত্রির গমনাগমন হয় না, তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী দেশের হুকুম পালন করতে হবে, যেখানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সময়ের আবর্তন-বিবর্তন হয়।[3]

শাদ্দাদ বিন আউস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের আঠারতম দিন অতিক্রান্তের পর আমার হাত ধরে বাকি' অঞ্চলে এক ব্যক্তির নিকট গেলেন, সে সিংগা নিচ্ছিল। রাসূল বললেন :—

أفطر الحاجم والمحجوم.

---

[1] বোখারি : ১৮৫৩। দ্র : ইবনে উসাইমিন, মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন।

[2] সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭।

[3] বোখারি : ১৮৫৩। দ্র : মাজমুউ ফাতাওয়ায়ে ইবনে উসাইমিন।

সিংগাগ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের রোজা নষ্ট হয়ে গেছে।[1]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এরশাদ করেছেন—

من أفطر في شـــهر رمضـــان ناســـياً فلا قضاء عليه ولا كفارة.

রমজানে কেউ যদি ভুলে খাদ্যগ্রহণ করে, তবে তার উপর কাজা ও কাফ্ফারা— কোনটিরই প্রয়োজন নেই।[2]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে—

من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه

রোজা অবস্থায় যে ব্যক্তি ভুলে খাবার গ্রহণ করবে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে নেয়, কারণ, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[3]

আবু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ...অত:পর রাসূল বললেন, ইমাম সালাত সমাপ্ত করা অবধি যে ব্যক্তি তার সাথে সালাত আদায় করে যাবে, তাকে পূর্ণ রাত্রির সওয়াব প্রদান করা হবে।[4]

আব্দুল্লাহ বিন আউফা বর্ণিত হাদিসে আমরা দেখতে পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্মের মাধ্যমে সাহাবিদের সামনে নমুনা পেশ করে তাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। উক্ত সাহাবি বলেন : একবার আমরা রমজান মাসে রাসূলের সাথে সফরে ছিলাম। সূর্য অস্তমিত হলে তিনি বলেন : হে অমুক ! নেমে এসে আমাদের জন্য ছাতু-মিশ্রিত ইফতার পেশ কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! এখনও তো দিবস অবশিষ্ট রয়েছে !? তিনি পুনরায় বললেন : নেমে এসে ছাতু মিশ্রিত ইফতার পেশ কর। লোকটি তখন নেমে খাবার পেশ করল।

---

[1] আবু দাউদ : ২৩৬৯। হাদিসটি সহি।

[2] ইবনে খুযাইমা : ১৯৯০, ইবনে হিব্বান : ৩৫২১, সূত্রটি হাসান।

[3] বোখারি : ৬২৯২।

[4] আবু দাউদ : ১৩৭৫, হাদিসটি সহি।

অত:পর রাসূলের নিকট তা উপস্থিত করলে তিনি তা পান করলেন। এরপর হাতের ইশারায় বললেন, সূর্য যখন এ স্থান হতে এ স্থানে অস্ত যাবে, এবং রাত্রি এ অবধি চলে আসবে, তখন রোজাদার ইফতার করবে।[1]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল এরশাদ করেছেন :—

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ.

যার অনিচ্ছায় বমি হবে, তার কাজা নেই, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, সে কাজা করে নেয়।[2]

তালিম ও শিক্ষাদানই পৃথিবীতে আগত নবি ও রাসূলদের কর্তব্য, যারা অনুসারী দায়ি ও সালিহীন, তাদের কর্তব্যও তাই হবে—এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূল এরশাদ করেছেন—

إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে (অপরকে) কষ্ট প্রদানকারী কিংবা কষ্টে নিপতিতরূপে প্রেরণ করেননি ; বরং, তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন সারল্য আনয়নকারী শিক্ষকরূপে।[3]

উমর বিন খাত্তাব কূফাবাসীর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, আমি আম্মারকে আমিররূপে প্রেরণ করেছি, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদকে প্রেরণ করেছি শিক্ষক ও গভর্ণররূপে।[4]

তালিম উম্মতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব, যা একই সাথে সম্মানের ও মর্যাদার, ব্যক্তির মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় যাকে কেন্দ্র

---

[1] মুসলিম : ১১০১।

[2] আহমদ : ১০৪৬৮, হাদিসটি সহি।

[3] মুসলিম : ১৪৭৮।

[4] বোখারি : ৬৭৩৪।

করে, বৃদ্ধি পায় পরকালীন পুরস্কার, সৎকাজের অপার সম্ভাবনা, বিস্তৃত হয় সার্বিক কল্যাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন, কথায়-বক্তব্যে, কর্মে-প্রতিফলনে রূপ দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গভাবে। রাসূলের পুণ্যবান সাহাবিগণ এ ব্যাপারে নানা সাক্ষ্য দিয়েছেন। মুআবিয়া বিন হাকাম হতে বর্ণিত, রাসূলের তালিমের উল্লেখ করে তিনি বলেন : আমার পিতা-মাতা তার তরে উৎসর্গিত, আমি তার পূর্বে কিংবা পরে তার তুলনায় উত্তম কোন শিক্ষকের সন্ধান পাইনি। আল্লাহর শপথ ! তিনি কখনো আমার সাথে কঠোরতা করেননি, প্রহার করেননি কখনো, কিংবা কটুবাক্য বলেননি।[1]

রমজান হচ্ছে আলেম ও দায়িদের জন্য তালিম ও দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ ও উপযুক্ত সময়,—ইসলাম ও ঈমানের হাকিকত এবং স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরে, সর্বাত্মক শ্রম ব্যয়ে তাদের সামনে ইসলামি জীবন-যাপনের মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতির উত্তম নমুনা পেশ করে তারা এ সময়টির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেন। রমজানে অধিক হারে মানুষের মসজিদমুখী হওয়ার ফলে সময়টি আমাদের জন্য খুবই উপযোগি—সন্দেহ নেই। এতে আমরা মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে আরো গভীর অনুসন্ধানী ও আগ্রহী করে তুলতে পারি, উদ্দীপিত করতে পারি কল্যাণ ও সৎকাজের পথে।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই, সমাজে যারা বিভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, শ্রমে ও নিষ্ঠায় নানা উপকরণ ব্যবহার করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ভ্রষ্ট মতবাদ। বরং, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, মতবাদ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ধারণে তারা খুইয়ে দিচ্ছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ফলশ্রুতিতে ক্রমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের বিভ্রান্ত মতবাদ ও জীবনাচার, সত্যপথ-বিচ্যুত হচ্ছে অগণিত জনগোষ্ঠী।

---

[1] মুসলিম : ৭৩৫।

তাই, এ ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও প্রস্তুতিগত সূচনায় দাওয়াত ও ইসলাহের মহান ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত সচেতন কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। উদ্ভাবন করতে হবে পদ্ধতিগত নতুনত্ব। ফলে মানুষ সৎকাজ ও সৎপথে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে, তাদের মাঝে বিস্তার ঘটবে ইলম ও আমলের, রক্ষা পাবে প্রবৃত্তির আকর্ষণ হতে।

সাহাবিদের উদ্দেশ্যে রাসূলের ওয়াজ ও বয়ান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে সাহাবিদের বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতেন, বাতলে দিতেন সত্য ও ন্যায়ের পথ। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিস হতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ পালন করতেন, মসজিদে খেজুর গাছের শাখায় বানানো তাঁবু টানাতেন। তিনি বলেন : একদা তিনি মুখমণ্ডল বের করে এরশাদ করলেন, সালাত আদায়কারী তার রবের সাথে মোনাজাত করে, তোমাদের প্রত্যেকের ভাবা উচিত, সে কীসের মাধ্যমে তার রবের সাথে মোনাজাত করবে। তোমাদের কেউ (অপরকে কষ্ট প্রদান করে এমন) উচ্চস্বরে পাঠ করবে না।[1]

মানুষের আত্মা সৎ ও সঠিক পথে বহাল ও দৃঢ় থাকার জন্য প্রয়োজন তাকে সর্বদা সজাগ রাখা, ওয়াজ ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে সতেজ রাখা, উদ্বুদ্ধ করা এবাদতের পথে। রমজানের দিবস ও রাত্রিগুলো, সন্দেহ নেই, মানুষকে উপদেশ প্রদান ও ওয়াজ-নসিহতের জন্য খুবই উপযোগী। এ মহান সময়গুলোতে দায়ি ও মুসলিহগণ আল্লাহর মহত্ত্ব ও সিফাত বিষয়ে মানুষকে জানাবে, উন্মোচন করবে আত্মার স্বরূপ, তার দৌর্বল্য ও প্রয়োজনগুলো ; পার্থিব বিষয়ের

[1] আহমদ : ৫৩৫৯, হাদিসটি সহি।

প্রকৃতি, তার ক্ষণস্থায়িত্ব, আখেরাতের মাহাত্ম্য ও চিরস্থায়িত্ব—ইসলামি জীবনাচারের এ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে সকলকে অবহিত করবে। তাদের জানাবে, বান্দার পরিণতি হয়তো চিরস্থায়ী জান্নাত কিংবা জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় অঙ্গারে পরিণত হওয়া। কোরআনে এসেছে—

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: ٦]

যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর ; তার পাহারায় থাকবে কঠিন-কঠোর ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর নির্দেশ বিষয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না, বরং, পালন করে যায়, যা তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[1]

সৎকর্মে সাহাবিদেরকে রাসূলের সর্বাত্মক নিয়োগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে সাহাবিদেরকে সর্বাত্মক সৎকর্মে নিয়োগ করতেন, তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা জোগাতেন নানা কল্যাণ-কর্মে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—রাসূল এক হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করেন:—

والذي نفسـي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؛ الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.

যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ ! রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশকের তুলনায় আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় ; সে আমার উদ্দেশ্যে তার

---

[1] সূরা আত তাহরিম, আয়াত ৬।

পানাহার ও প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, রোজা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান। পুণ্যকর্মের প্রতিদান দশগুণ।[1]

ভিন্ন শব্দে একই হাদিস এসেছে এভাবে—

كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز و جل:إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.

আদম সন্তানের যাবতীয় আমলই বৃদ্ধি পায়। পূন্যকর্মের প্রতিফল দশ থেকে সাত শত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন : ...তবে রোজা এর ব্যতিক্রম, নিশ্চয় তা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান। রোজাদার তার প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিত্যাগ করেছে আমার জন্য। রোজাদারের আনন্দের মুহূর্ত দুটি—ইফতারকালিন ও রবের সাথে সাক্ষাৎকালীন। নিশ্চয় তার মুখের দুর্গন্ধ মেশকের সুগন্ধি হতেও আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম।[2]

উসমান বিন আবুল আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে,

الصيام جُنَّة من النار، كجُنَّة أحدكم من القتال.

রোজা তোমাদের ব্যবহৃত যুদ্ধের ঢালের মত জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার ঢাল।[3]

আবু হুরায়রা রা. রাসূল হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন:—

الصيام جُنَّة، وحصن حصين من النار.

---

[1] বোখারি : ১৮৯৪।

[2] মুসলিম : ১১৫১।

[3] ইবনে মাজা : ১৬৩৯, হাদিসটি সহি।

রোজা ঢাল, এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী মজবুত দুর্গ।[1]

আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

من صام يوما في سبيل الله بَعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে জাহান্নাম হতে সত্তুর বছর দূরে রাখবেন।[2]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الصيام والقرآن يشفعان للعبد، فيقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيُشَفَّعان.

সিয়াম ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে : হে প্রতিপালক ! দিবসে আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কোরআন বলবে : রাতে আমি তাকে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন ; তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।[3]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

---

[1] আহমদ : ৯২১৪, সূত্রটি হাসান।

[2] বোখারি : ২৬৮৫।

[3] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান অধ্যায় : ১৯৩৮, হাদিসটি সহি।

ইমান ও ইহতেসাবের সাথে যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর যাপন করবে, তার ইতিপূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি রমজান মাস জুড়ে ইমান ও ইহতেসাবের সাথে রোজা রাখবে, তারও ইতিপূর্বের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়া হবে।[1]

তারই বর্ণিত ভিন্ন এক হাদিসে এসেছে—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে রমজানে রাত যাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। তিনি বলতেন :—

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি ইমান ও ইহতেসাবের সাথে রমজান মাসে রোজা রাখবে, তার ইতিপূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[2]

অপর হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা বলেন : আমি রাসূলকে রমজানের রাত যাপনে উৎসাহ দিতে শুনেছি।

আবু সাইদ খুদরি বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

... ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها؛ فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر.

অত:পর তিনি বললেন : আমি এ দশে সম্মিলিতভাবে এতেকাফ যাপন করতাম, অত:পর আমাকে জানান হল শেষ দশ দিনে সম্মিলিতভাবে যাপনের জন্য। যে আমার সাথে এতেকাফে আগ্রহী, সে যেন তার এতেকাফগাহে অবস্থান করে। এ রাত আমাকে দেখানো

[1] বোখারি : ১৯০১।

[2] মুসলিম : ৭৫৯।

হয়েছিল, কিন্তু আমি তা বিস্মৃত হয়েছি। তোমরা শেষ দশ দিনে তার সন্ধান কর। তোমরা প্রত্যেক বেজোড়ে তা অনুসন্ধান কর।[1]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে—

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এতেকাফে আগ্রহী, সে যেন ফিরে আসে (এতেকাফে বসে), আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, আমি তা বিস্মৃত হয়েছি। নিশ্চয় তা শেষ দশ দিনের বেজোড়ে।[2]

উবাদা বিন সামেত বর্ণিত হাদিসে এসেছে—লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে অবগত করানোর জন্য রাসূল বের হলেন, তখন দেখতে পেলেন, মুসলমানদের দু ব্যক্তি বাদানুবাদে লিপ্ত, অত:পর তিনি বললেন : আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে তোমাদের জানানোর জন্য বেরিয়ে ছিলাম। অমুক অমুক ব্যক্তির বাদানুবাদের ফলে তা তুলে নেয়া হয়। হয়তো তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সুতরাং, তোমরা (শেষ দশ দিনের) সাত, নয় ও পাঁচে তার অনুসন্ধান কর।[3]

আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :—

ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عزو جل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না : ন্যায়পরায়ণ শাসক, ইফতার করা অবধি রোজাদার, এবং মজলুমের দোয়া—যা মেঘকে ছাড়িয়ে যায় এবং আকাশের দ্বার যার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়,

---

[1] বোখারি : ২০১৮।

[2] বোখারি : ৮১৩।

[3] বোখারি : ৪৯।

আল্লাহ পাক বলেন : আমার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ ! বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।[1]

আবু সাইদ খুদরি রা, বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :—

إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة – يعني في رمضان –، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة.

রমজানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তাআলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলমানের দোয়া কবুল করা হয়।[2]

যায়েদ বিন খালেদ জুহানি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :—

من فطّر صائماً كان له مثل أجرهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً.

যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।[3] ইফতার পরিমাণে স্বল্প হোক কিংবা অধিক—উভয় ক্ষেত্রে একই হুকুম। এ আল্লাহ তাআলার রহমত, ফজিলত ও এহসানের অনুপম নিদর্শন।

জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

عمرة في رمضان تعدل حجة.

---

[1] আহমদ : ৮০৪৩।

[2] সহি আত তারগিব ওয়াত তারহীব : ১০০২।

[3] ইবনে মাজা : ১৭৪৬।

রমজানে ওমরা হজের সমতুল্য ।[1]

অপর এক হাদিসে তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন :—

إن لله عند كل فطر عتقاء. وذلك في كل ليلة.

প্রতি ইফতারকালে আল্লাহ তাআলা অনেককে মুক্তি প্রদান করেন, আর তা প্রতি রাতেই ঘটে থাকে ।[2]

সাহাবিদেরকে ক্রমাগত সৎকাজে এভাবে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, রাসূল তাদের কল্যাণ বিষয়ে ছিলেন সর্বোচ্চ সচেতন। আত্মা পূর্ণতার যতই ঊর্ধ্বে আরোহণ করুক না কেন, তা সর্বদা উপদেশ ও দিক নির্দেশনার মুখাপেক্ষী।

ওয়াজ এক ধরনের উপদেশ প্রদান পদ্ধতি, যা নববি আদর্শে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, যা সকলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যে ওয়াজ করবেন, স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ ও পদ্ধতিগত কৌশল সম্পর্কে তাকে সজাগ থাকতে হবে।

ইবনে মাসঊদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব যত্নের সাথে সে দিনগুলোতে আমাদের ওয়াজ করতেন, এবং আমরা বিরক্ত হচ্ছি কি না তার প্রতিও খেয়াল রাখতেন।[3] স্বত:স্ফূর্ত থাকাকালীন তিনি আমাদের ওয়াজ-নসীহত করতেন, এবং সর্বদা তা করতেন না।

উম্মতের মহান পূর্বসূরীগণের মাঝে আমরা এমন কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি, ওয়াজ পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে যারা ছিলেন প্রবাদতুল্য ; যেমন হাসান বসরি, ইবনে জাওজি।

---

[1] আহমদ : ১৪৩৭।

[2] ইবনে মাজা : ১৬৪৩, হাদিসটি হাসান।

[3] বোখারি : ৬৮।

ইমাম আহমদ বলেন : মানুষের জন্য একজন সত্য গল্পকারের খুবই প্রয়োজন।[1] তবে, বর্তমান যুগে একটি শ্রেণি সেই মহান পূর্বসূরীগণের অনুসরণের নামে প্রচলন করেছে ওয়াজের এমন পদ্ধতি, কৌশলগতভাবে যা খুবই বিভ্রান্তিকর ও দুর্বল। আত্মায় তার সামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাদের ওয়াজ কখনো হয় দুর্বল, সকলের মন জুগিয়ে বলা, ফলে শুভ-পরিণাম শূন্য, আর কখনো কঠোর, মানুষের মন-মানসিকতার প্রতি পরোয়াহীনভাবে বলা—এ ধরনের ভারসাম্যহীন ওয়াজ পদ্ধতির ফলে আমরা দেখছি এই সমাজে ওয়াজ হয়ে পড়েছে খুবই ঠুনকো ব্যাপার, যা বিন্দুমাত্র প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

পূর্বের মহান ওয়ায়েজগণ মানুষের বিবেক ও আকলের দ্বারে আঘাত করতেন, জাগিয়ে তুলতেন শুভবুদ্ধির প্রাণ। কোরআন এক ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সকলকে সত্য পথে আহ্বানের কর্মপন্থা বাতলে দিয়েছে, কোরআন একই সাথে ওয়াজ করে, এবং সম্বোধন করে বিবেককে, বিবেকের দ্বারে বারংবার হানা দেয়, তাকে জাগিয়ে তোলে-উৎসাহিত করে সত্য-সুন্দর পথে পরিচালিত হতে।।

রমজানে রাসূলের বিভিন্ন সমস্যার শরয়ি সমাধান প্রদান

রমজানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানা সমস্যার শরয়ি সমাধান বাতলে দিতেন, সাহাবিদের কেউ প্রশ্ন করলে তার স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন, পাপ ঘটে যাওয়ার পরও, তওবা করে যে ব্যক্তি তার কাছে সমাধানের জন্য এসেছে, তাকেও ভর্ৎসনা করেননি তিনি।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত : এক ব্যক্তি রমজানে স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল। সে রাসূলকে এ বিষয়ে সমাধান জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, তোমার কি দাস রয়েছে ? সে বলল, না। তিনি

---

[1] তালবিসে ইবলিস : ইবনে জাওজি, ১৫০।

পুনরায় বললেন : তুমি কি দু মাস রোজা রাখতে পারবে ? সে বলল : না। রাসূল বললেন : তাহলে তুমি ষাট জন মিসকিনকে খাবার দিয়ে দিয়ো।[1]

এক রেওয়ায়েতে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : রমজানে এক ব্যক্তি মসজিদে রাসূলের নিকট আগমন করে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ! আমি বরবাদ হয়ে গেলাম ! রাসূল বললেন : কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূল বললেন : তুমি সদকা কর। সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর নবি ! আল্লাহর শপথ, আমার কিছুই নেই, আমি কিছুরই মালিক নই। তিনি বললেন, তুমি বস। সে বসে পড়ল। ইত্যবসরে এক লোক গাধার পিঠে খাবার বোঝাই করে নিয়ে উপস্থিত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বের বরবাদ হওয়া সে লোকটি কোথায় ? লোকটি দণ্ডায়মান হলে রাসূল বললেন, তুমি এগুলো দিয়ে সদকা আদায় কর। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ব্যতীত অন্য কাউকে দেব ? আল্লাহর শপথ ! আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছুই নেই। রাসূল বললেন, তবে তোমরাই সেগুলো খাও।[2]

সালাম বিন ছাখার আল আনসারি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كنت رجلاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤتَ غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرَقاً من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن

[1] মুসলিম : ১১১১।

[2] বোখারি : ১৯৩৫, মুসলিম : ১১১২।

يترل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟، قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟، قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟، قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا، فأمْضِ فيَّ حكم الله فإني صابر لذلك، قال: أعتق رقبة، قال: فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال: صم شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحْشَى، ما لنا عشاء!، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زُرَيق فقل له: فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناً، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السعة والبركة؛ أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليَّ، فدفعوها إلي.

তিনি বলেন : আমাকে সহবাসের এমন শক্তি দান করা হয়েছিল, যা অপর কাউকে প্রদান করা হয়নি। রমজান এলে আমি রমজান শেষ অবধি আমার স্ত্রীর সাথে জেহার[1] করলাম। কারণ, আমার ভয় ছিল রাতে তার সাথে আমি সহবাসে লিপ্ত হব, দিবস আগমন পর্যন্ত আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হতাম কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতাম না। এক রাতে আমার স্ত্রী আমার সেবা করছিল, হঠাৎ

[1] ظهر শব্দের অর্থ পৃষ্ঠদেশ। জাহেলি যুগে আরব সমাজে কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, তারা এভাবে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করাকে জেহার বলত। ইসলামে এর দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না, তবে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়।

তার দেহের কিছু প্রকাশিত হয়ে গেল, আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম। ভোর হলে আমি আমার গোত্রের কাছে গিয়ে বললাম : আমার সাথে রাসূলের নিকট চল, আমি তাকে আমার বিষয়টি (রাতের ঘটনা) জানাই। তারা উত্তর দিল, আমরা কোনভাবেই তোমার সাথে যাব না। আমরা আশঙ্কা করছি যে, আমাদের ব্যাপারে কোরআন নাজিল হবে কিংবা রাসূল আমাদের এমন কিছু বলবেন, যার কলঙ্ক আমাদের জন্য স্থায়ী হয়ে যাবে। বরং, তুমিই যাও, এবং যা ভালো মনে কর তাই কর। তিনি বলেন : অত:পর আমি একাই বের হলাম এবং রাসূলের দরবারে এসে তাকে বিষয়টি খুলে বললাম। রাসূল বললেন : তুমিই সেই ব্যক্তি ? আমি বললাম, হ্যা, আমিই। রাসূল বললেন : তুমিই সেই ব্যক্তি ? আমি বললাম, হ্যা, আমিই। রাসূল বললেন : তুমিই সেই ব্যক্তি ? আমি বললাম, হ্যা, আমিই। আমিই তো। আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কার্যকর করুন। আমি এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরব। তিনি বললেন : তুমি একজন দাসী আজাদ কর।

তিনি বলেন : আমি হাত দ্বারা আমার ঘাড়ে চাপড় মেরে বললাম, যে সত্ত্বা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ ! আমি (আমার ঘাড় ব্যতীত) কিছুরই মালিক নই। রাসূল বললেন, তবে দু মাস রোজা রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! রোজা রাখতে গিয়েই তো আজ আমার এ দশা। তিনি বললেন, তবে ষাটজন মিসকিনকে খাইয়ে দাও। আমি বললাম, সে সত্ত্বার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন গত রাত শূন্য অবস্থাতে আমরা কাটিয়েছি রাতের খাদ্য হিসেবে কিছুই ছিল না।

রাসূল বললেন, তুমি বনি জুরাইকের সদকা উসূলকারীর নিকট যাও, এবং বল। সে তোমাকে সদকার পণ্য প্রদান করবে। তুমি সেই পণ্য হতে নিজের পক্ষ হতে ষাটজন মিসকিনকে এক ওসাক[1] পরিমাণ

---

[1] ত্রিশ কেজি ছয় শত গ্রাম সমপরিমাণ।

প্রদান করবে, বাকি সব দিয়ে তোমার ও তোমার পরিবারের প্রয়োজন পুরণ করবে। তিনি বলেন, আমি অত:পর আমার গোত্রের নিকট আগমন করে বললাম, আমি তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি সঙ্কীর্ণতা আর ভুল মত। আর রাসূলের নিকট পেয়েছি প্রশস্ততা ও বরকত। আমাকে তোমাদের সদকা গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তা আমার কাছে হস্তান্তর কর। অত:পর তারা তাই করল।[1]

বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে লোকেরা তার নিকট আগমন করত, তাকে প্রশ্ন করে আলোচনায় অংশ নিত। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তারা একজন সম্মানিত দয়ার্দ্র শিক্ষকের আশ্রয়ে আছে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি সকলের সমাধান হাজির করতেন, কখনো রসিকতা করতেন, ঠাট্রাচ্ছলে তাদের সংশয় দূর করতেন। আদি বিন হাতেম রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে আমরা এর উত্তম উদাহরণ পাই। তিনি বলেন :—

لما نزلت هذه الآية:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}، قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه و سلم فضحك، فقال:إن وسادك إذن لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار.

যখন কোরআনের এ আয়াত নাজিল হল—যতক্ষণ না সাদা সুতো কাল সুতো হতে পৃথক হবে—আমি একটি সাদা এবং একটি কাল সুতো নিলাম, (রাতে) বালিশের নীচে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকে পৃথক-স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। আমি বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করালে তিনি

[1] তিরমিজি : ৩২৯৯।

হেসে ফেললেন। বললেন : তবে তো তোমার বালিশ খুবই লম্বা ও প্রশস্ত ! (কোরআনে বর্ণিত) এর মর্ম হচ্ছে রাত ও দিন।[1]

রাসূল, উক্ত হাদিসে, তাকে কাজা করার আদেশ প্রদান করেননি। সুতরাং এতে প্রমাণ হয়, হুকুম সম্পর্কে অনবগতি কাজার ওয়াজিবকে তুলে নেয়।[2]

রাসূলের জীবনের এ ঘটনা প্রবাহ, কর্মপন্থায় এমন ভারসাম্য আচরণ ও নীতি অবলম্বন, সন্দেহ নেই, সকলের কাছে রেসালাতকে করে তুলেছে আন্তরিক, সৌহার্দ্যময়, তাদের হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছে দয়ার্দ্রতায়। দাওয়াতি জনগোষ্ঠীদের সাথে আচরণে তাদের করে তুলেছে সতত করুণাময়, সহিষ্ণু ; প্রশ্নের ব্যাপারে সহনশীল, অপরাধের ক্ষেত্রে রহম-দিল।

এ এমন এক গুণ ও আচরণ, বর্তমান সময়ে ইলম, দাওয়াত, ও ইসলাহের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের মাঝে যার দুর্বলতা খুবই প্রতীয়মান। অপরাধী ও পাপে নিমজ্জিতদের ক্ষেত্রে যাদের ধারণা ও ভাবনা হল, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা, ও ক্রমাগত কোণঠাসা করে ফেলাই হচ্ছে তাদের পাপ স্খলনের একমাত্র উপায় ও প্রতিকার, রাসূলের এ আচরণ তাদের চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা দেয়। বিস্মৃত হয় তারা রাসূলের হেদায়েতের আলোকময় পথ ও পদ্ধতি ;—রমজানে স্ত্রী সহবাসে আক্রান্ত সাহাবির

---

[1] বোখারি : ১৮১৭, আবু দাউদ : ২৩৪৯।

[2] শরিয়তের নুসুসের প্রতি লক্ষ্যকারী মাত্রই জানবেন, তিন শর্ত ব্যতীত রোজা বিনষ্ট হয় না : প্রথমত, জানা। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি রোজা ভঙ্গের কারণ ভুলে সংঘটিত করে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। রোজা বিনষ্টের কারণটি সম্পর্কে সে অনবগত থাকুক, কিংবা অবগত হয়েও যদি তার সময় জ্ঞান না থাকে— যেমন, সময় ভুলে ফজরের পরও সে খাবার গ্রহণ করল।

দ্বিতীয়ত, রোজা বিষয়ে স্মরণ থাকা। সুতরাং, যদি কেউ বিস্মৃত হয় যে, সে রোজাদার, রোজা ভঙ্গের কারণ ঘটলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে, তার আশেপাশে সংশ্লিষ্ট লোকদের দায়িত্ব তাকে জানিয়ে দেয়া।

তৃতীয়ত, স্বেচ্ছায় রোজা ভঙ্গের কারণ ঘটানো। যাকে বাধ্য করা হবে, তার রোজা ভাঙবে না। দ্র : মাজমুউ ফাতাওয়ায়ে ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ২৭৭-২৮১।

সাথে আচরণ[1] ; যে ব্যক্তি মসজিদে মূত্র ত্যাগ করেছিল[2], কিংবা যে কথা বলে উঠেছিল সালাত আদায়কালীন[3], এমনকি যে ব্যক্তি যিনার অনুমতি চেয়ে রাসূলের কাছে আবেদন করেছিল[4] তাদেরকে সুপথ বাতলে দেয়ার যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তা তারা ভুলে যায়, এবং কঠোরতা আরোপের ফলে দাওয়াতি জনগোষ্ঠীকে ক্রমে দূরে ঠেলে দেয় ইসলাম ও ইসলামি বিশ্বাস হতে।

অপরের সাথে বন্ধুভাব বজায় রাখা, করুণা, ব্যক্তির কাছে স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে যাওয়া, মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শ্রবণ, উত্তর প্রদানে সহনশীল হওয়া, সহাস্যমুখে কথোপকথন...মানুষের অন্ত র জয় ও তাতে প্রভাব বিস্তারের প্রাথমিক ও অব্যর্থ মাধ্যম, এভাবে মানুষের অনুভূতিতে নিজের কথা-বক্তব্য ও ভাবনা অনায়াসে সঞ্চার করে দেয়া যায়।

মানুষের মুক্তি, তাদের জ্ঞানগত প্রবৃদ্ধি, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাসন—ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলেম সমাজ, দায়ি ও মুসলিহদের এর প্রতি লক্ষ্য বৈ পথ নেই। বিশেষত, দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল হওয়ার ফলে বরকতময় রমজান মাসে এর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য বলেই আমার বিশ্বাস। এ সময় মানুষ দলে দলে মসজিদে সমবেত হয়, দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণের তাড়না বোধ করে আন্তরিকভাবে, সিয়াম, জাকাত ও এতেকাফ বিষয়ে তারা নানাভাবে প্রশ্ন করে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে, শরিয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম, জান্নাত-জাহান্নাম, সওয়াব ও গোনাহ বিষয়ে তাদের নানা প্রশ্ন থাকে, সুতরাং, এ সময়টি দায়িদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

---

[1] বোখারি : ৬৮২২।

[2] বোখারি : ২২০।

[3] মুসলিম : ৫৩৭।

[4] আহম : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২২, তার সূত্রটি শুদ্ধ।

সময়, ইসলামি ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার এক উত্তম সময় রমজান মাস।

দ্বীনের এ প্রার্থীদের জন্য প্রয়োজন আন্তরিক ও করুণাময় দায়ির, যারা ক্ষতে হাত বুলিয়ে দেবে পরম মমতায়, তার চিকিৎসা করবে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে, পাপক্ষালন করবে ধীরে ধীরে, এভাবে একসময় পাপীর সামনে বিষয়টির মন্দত্ব ফুটে উঠবে, সে এতে প্রত্যাবর্তনকে ঘৃণা করবে চূড়ান্তভাবে। সৎ ও সঠিক পথকে চেনে নিবে, তাকে আঁকড়ে ধরবে চিরকালীন আবেগে।

বিভিন্নভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের রমজান ও রোজা বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন। উমর বিন আবি সালামা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলকে প্রশ্ন করলেন, রোজাদার কি চুম্বন করতে পারবে ? রাসূল তাকে বললেন, তুমি উম্মে সালামাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নাও। উম্মে সালামা তাকে জানালেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ (চুম্বন) করতেন। উমর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন ! রাসূল বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম তাকওয়া অবলম্বনকারী ও আল্লাহ ভীরু।[1]

যামারা বিন আব্দুল্লাহ বিন আনিস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি বনি সালামার এক মজলিশে ছিলাম। আমি ছিলাম তাদের সর্বকনিষ্ঠ। তারা বলাবলি করল, আমাদের হয়ে কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল কদর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে ? এ ছিল রমজানের একুশ তারিখের ভোরবেলার ঘটনা। আমি বেরুলাম, মাগরিবের সালাতকালীন রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তার গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হলে তিনি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন ; বললেন, প্রবেশ কর ! আমি প্রবেশ করলে আমাকে

---

[1] মুসলিম : ১১০৮।

তার রাতের খাবার দেয়া হল, তিনি দেখতে পেলেন খাবার স্বল্পতার কারণে আমি আহার হতে বিরত থাকছি। আহার শেষে তিনি আমাকে বললেন, আমার জুতো এনে দাও। তিনি দণ্ডায়মান হলে আমিও তার সাথে দণ্ডায়মান হলাম। তিনি বললেন, তোমার কি কোন প্রয়োজন ছিল? আমি বললাম, হ্যা। বনি সালামার একদল লোক আমাকে আপনার কাছে লাইলাতুল কদর বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করেছে। তিনি বললেন, (আজ) কততম রাত্রি ? বললাম, বাইশতম রাত্রি,— বর্ণনাকারী পরবর্তীতে তার মত পাল্টে বলতেন, না বরং পরের রাত্রি, অর্থাৎ তেইশতম রাত্রি।[1]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : উবাই বিন কা'ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আজ রাতে একটি ঘটনা ঘটেছে। তিনি বললেন, উবাই, কি ঘটেছে ? উবাই বললেন, আমার গৃহের কয়েকজন নারী বলল : আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব না, বরং, আপনার সাথে সালাত আদায় করব। তিনি বলেন, আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত সালাত আদায় করলাম, অত:পর বিতির পড়ে নিলাম। তিনি বলেন, মনে হল, রাসূল অনেকটা সম্মত, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।[2]

নানা বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হলেও, দ্বীন ও দ্বীনাচারে উম্মত খুবই আগ্রহী, এ ব্যাপারে কেউ কেউ ঘোর অলসতা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেও, অধিকাংশের মাঝেই আমরা এই প্রবণতা ও আগ্রহ দেখতে পাই। সুতরাং, উম্মতের দায়িত্বশীল আলেম সমাজের কর্তব্য ও পালনীয় হল : মানুষের কাছে দ্বীনের পরিপূর্ণ উন্মোচন, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করে, বিস্তৃত আকারে শরিয়তের যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞাত করা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও উত্তম উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে ধর্মাচার প্রবণ করে তোলা। যারা বেদআতে আক্রান্ত

[1] আবু দাউদ : ১৩৭৯, হাদিসটি সহি।

[2] ইবনে হিব্বান : ২৫৪৯।

, প্রবৃত্তির পূজায় নিবিষ্ট, বিচ্ছিন্নভাবে উম্মতকে নতুন জাহেলি দীক্ষায় দীক্ষিত করবার পাঁয়তারায় লিপ্ত, তাদেরকে সুযোগগুলো গ্রহণে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না। উম্মতের সাধারণ জনগোষ্ঠী জ্ঞান ও মূর্খতা নির্ধারণে হয়ে পড়েছে অপরাগ, তাদের সামনে জাহেল ও আলেম একই রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সৎ-অসতের মাঝের পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে নিদারুণভাবে। এমন করুন পরিস্থিতি, সন্দেহ নেই, সময়কে করে তুলছে আরো বিপদাক্রান্ত ও সংকটাপন্ন।

ইলমের প্রসার ও বিস্তার, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে সৎকাজের প্রতি সকলকে আগ্রহী ও বেগবান করে তোলায় আলেমদের ভূমিকার নবায়ন কি আমরা দেখতে পাব ? দায়ি ও মুখলিসগণ কি তাদের শ্রম উজাড় করে এ পথে সফল হওয়ার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবেন ? কাটিয়ে দিবেন আলস্য ও মূর্খতার ঘোর অমানিশা ? তারা কি সতর্ক হবেন ? হয়তো, কিন্তু সময় ততদিনে অতিবাহিত হয়ে যাবে, হাতছাড়া হয়ে যাবে যাবতীয় সহায়-সুযোগ, আমরা ব্যর্থ হব পতনোন্মুখ একটি জাতিকে রক্ষা করতে।

পাশাপাশি, তালিবুল ইলমদের যে বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য, তা হচ্ছে কঠোরতা ও সহজতা আরোপের মাঝে সরল ভারসাম্য বজায় রাখা। অতি রক্ষণশীলতা আরোপ করে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে সকলকে অনাগ্রহী করে তুলবে না। কারণ, যা হারাম, তাকে হালাল করা যেমন পাপের, তেমনি পাপের যা হালাল, তাকে হারাম করা। এবং যা ওয়াজিব নয়, তাকে ওয়াজিব করাও ওজুব ভাঙ্গার নামান্তর। কিংবা সহজতা ও সারল্য আরোপ করবে না, এবং করুণা-পরবশ হয়ে শরিয়তের হুকুম লঙ্ঘনও করবে না। কোরআন ও সুন্নাহ যে বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা উপস্থাপন করেছে, রক্ষণশীলতা ও সহজতার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, কঠোর মনে হোক কিংবা সহজ, তাতে নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করা সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

রাসূলের ইমামতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ বছরই ইমামতি করতেন, সকলে তার পিছনে সালাত আদায় করত। তবে, বিশেষভাবে রমজান মাসে তার ইমামতির কিছু প্রমাণ আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি—

আব্দুল্লাহ বিন আনিস রা. হতে বর্ণিত :—

أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: أُريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلي الله عليه و سلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অত:পর আমি তা বিস্মৃত হয়েছি। সে ভোরে আমাকে দেখানো হয় যে, আমি পানি আর কাদায় সেজদা দিচ্ছি। রাবি বলেন, তেইশতম রাত্রিতে বৃষ্টি হল, রাসূল আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং প্রস্থান করলেন ; পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল তার কপাল ও নাকে।[1]

আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد: فإنه لم يخْفَ عليَّ مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.

...ফজরের সালাতের জন্য তিনি বেরুলেন ; ফজর সালাত সমাপ্ত করে মানুষের দিকে অভিমুখ হলেন, তাশাহ্হুদ পাঠ করে বললেন, আমি তোমাদের অবস্থানের ব্যাপারে অবিদিত নই, কিন্তু আমার ভয়

---

[1] মুসলিম : ১১৬৮।

হয় তোমাদের উপর তা ফরজ করে দেয়া হবে এবং তোমরা তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে।[1]

রাসূল কেবল ফরজ সালাতেই ইমামতি করতেন না, কারণ, রমজানের কোন কোন রাত্রিতে তিনি সাহাবিদের নিয়ে সালাত জামাতের সাথে আদায় করেছেন, ইমামতি করেছেন স্বয়ং। এ আশঙ্কায় তিনি রাত জেগে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের বিষয়টি অব্যাহত রাখেননি যে এর ফলে তা ফরজ করে দেয়া হবে, এবং উম্মত যথা নিয়মে তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারে আরো হাদিস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়—

আবু যর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে রমজান মাসে রোজা পালন করেছি, কিন্তু তিনি রমজানের সাত দিবস বাকি থাকা অবধি আমাদের নিয়ে রাত জেগে সালাত আদায় করেননি। সপ্তম রাত্রিতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রি জাগরণ করলেন না।

পঞ্চম রাত্রিতে আমাদের নিয়ে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন। আমি বললাম, আপনি যদি পূর্ণ রাত্রি আমাদের সাথে নফল সালাত আদায় করতেন ?! তিনি বললেন, ব্যক্তি যদি ইমামের সালাত শেষ করা অবধি তার সাথে সালাত আদায় করে, তবে তার জন্য পূর্ণ এক রাত্রি জাগরণের সওয়াব লিখে দেয়া হয়। আবু যর বলেন, চতুর্থ রাত্রিতে তিনি আমাদের নিয়ে রাত জাগলেন না।

তৃতীয় রাত্রিতে তার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-গণ, অন্যান্য সকলকে একত্রিত করলেন, তিনি আমাদের নিয়ে এতটা সময় সালাত আদায়

---

[1] বোখারি : ৯২৪।

করলেন যে, সেহরির সময় অতিক্রান্তের আশঙ্কা হল। এর পর বাকি মাস আর রাত্রি জাগলেন না।[1]

উম্মুল মোমিনীন আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أن رسول الله صلي الله عليه و سلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه و سلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان.

এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সালাত আদায় করলেন, লোকেরাও তার সাথে সালাতে যোগ দিল। পরবর্তী রাতেও সালাত আদায় করলেন, অংশগ্রহণকারী লোকদেরও সংখ্যা বেড়ে গেল।

তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রিতে সকলে সমবেত হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন না। ভোর হলে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ, আমি তা দেখেছি। কেবল এ আশঙ্কাই আমাকে বেরুতে বাধা দিয়েছে যে, হয়তো তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হবে। তিনি বলেন, আর তা রমজানে।[2]

ফজিলতময় এ মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে মুসলমানদের ইমাম হবেন—এটাই স্বাভাবিক, কারণ, তিনি ছিলেন হেদায়েতকারী, সুসংবাদদাতা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শরিয়ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ; পরকাল দিবসে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার কালে কি করে

---

[1] আবু দাউদ : ১৩৭৫, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ৭২৯, মুসলিম : ৭৬১।

মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে—অহরাত্র সেই চিন্তায় বিভোর থাকতেন তিনি।

ইমামত হচ্ছে হেদায়েত, নসিহত, ও মানুষকে শরিয়তের অনুবর্তী করে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম—যে ব্যক্তি ইমামতের সুযোগ লাভ করেছে, এ মহান দায়িত্ব পালনের মত নিজেকে যদি সে পুরোপুরি যোগ্য ও উপযুক্ত-প্রস্তুত মনে করে, তবে তা গ্রহণ করাই উত্তম। সন্তুষ্ট চিত্তে, শুভ পরিণতির মনে করে সে এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে, পরকালে আল্লাহ কর্তৃক সওয়াব লাভের আশায় পূর্ণভাবে দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য শ্রম ব্যয় করবে।

যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করবে, অনুসরণকারী সকলের সমপরিমাণ সওয়াব তাকেও দান করা হবে—বিন্দুমাত্র তারতম্য করা হবে না। ইসলামকে মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি প্রতিস্থাপন করবার এ এক অনিন্দ কৌশল। এভাবেই, ইসলাম বাধাহীনভাবে পৌঁছে গেছে মানুষ ও মানুষের বিবেকের দুয়ারে দুয়ারে, যা আর কখনো প্রতিরোধ্য হবার নয়।

সালাত শেষে রাসূলের আলোচনা ও খুতবা প্রদান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে কোন কোন সালাত শেষে খুতবা প্রদান করতেন, আলোচনা করতেন বিভিন্ন বিষয়ে। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে—

فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة! فلم يخرج إليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد: فإنه لم يخفَ علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.

তাদের অনেকে বলছিল : 'সালাত' ! কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের পূর্বে বেরুলেন না। ফজরের সালাত শেষে তিনি মানুষের মুখোমুখি হলেন, তাশাহহুদ পাঠ শেষে তিনি এরশাদ করলেন : তোমাদের ব্যাপারটি আমার অবিদিত নয়। কিন্তু, আশঙ্কা হয়েছিল যে, তোমাদের জন্য (এ সালাত) ফরজ করে দেয়া হবে এবং তোমরা তা (পালনে) অক্ষম হয়ে পড়বে।[1]

আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলের সাথে রমজানের দশ দিন এতেকাফে যাপন করলাম। বিশ তারিখ ভোরে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবায় বললেন, আমাকে লাইলাতুল কদর প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা বিস্মৃত হয়েছি।[2]

ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে—

তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন, নির্দেশ দিলেন তাদের আল্লাহর ইচ্ছা সম্বন্ধে।[3]

খতিব ও ইমামদের মাঝে যাদের রয়েছে এ বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভা, তাদের দায়িত্ব হল এর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা, এর সফল রূপায়ণে সর্বস্ব নিয়োগ করা। আমরা এমন এক সময় যাপন করছি, যখন মসজিদ ও মসজিদ ভিত্তিক প্রভাব অনেকাংশেই খর্ব হয়ে গিয়েছে, ইমাম ও খতিবদের প্রভাব-পরিধি ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়ে চলেছে। সামাজিক এ দিকটির প্রতি যদি দায়ি ও ইমামদের অনীহা একটি স্থায়ী সমস্যায় রূপ নেয়, তবে এক সময় আমরা এক ভয়াবহ কেন্দ্রিকতার মুখোমুখি হব, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব সমাজ ও সামাজিক অনুষঙ্গ থেকে, সৃষ্টি হবে পরিচয়গত সংকট। প্রবল সতর্কতা ও দ্বীনের কাজে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগই কেবল এ সংকট উত্তরণের পথ তৈরি করতে পারে।

---

[1] বোখারি : ১১২৯, মুসলিম : ৭৬১।

[2] বোখারি : ২০১৬।

[3] নাসায়ি : ১৩৫৬, হাদিসটি সহি।

একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও অপরদিকে বর্তমান পরিস্থিতি যার একান্ত নখদর্পণে, যে পাঠ করেছে সমাজ ও নৈতিকতার এ বিষয়গুলো, তিনি নি:সন্দেহে অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, সমাজ ও সামাজিকতার অধিকাংশ স্তরে মসজিদ ভিত্তিক এ ক্ষমতা ও কেন্দ্রিকতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, ভেঙে পড়েছে এ ব্যবস্থা। মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয় আন্দোলন ও চারিত্রিক অবগঠন ইসলামের অধিকাংশ এলাকাতেই আজ ভঙ্গুর-হীনদশায় আক্রান্ত। এর স্থলে আপন অবস্থান মজবুত করছে অন্যান্য অপসংস্কৃতির কর্তৃত্ব, বিভ্রান্তিকর মতবাদ, পুরোনো যাবতীয় চারিত্রিক অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বসে গিয়ে জন্ম নিচ্ছে নতুন চেতনা, নতুন জীবনাচার পদ্ধতি।

ইসলাহ ও সংস্কারের কার্যকারিতা ও ফললাভের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, ধৈর্য, ও বিপুল পরিশ্রম। বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার অবনমনে ব্যয় হয়েছে যতটা সময়, কৌশল ও শ্রম, সন্দেহ নেই, এর তুলনাতেও তার পরিধি ও ব্যাপ্তি হবে আরো ব্যাপক ও সামগ্রিক। সাফল্য, মুক্তি ও মৌলিক নীতিমালার যা এখনও ক্ষীণ হয়ে টিকে আছে, তার সংরক্ষণ, প্রথমে, খুবই জরুরি। অবনতির এ দীর্ঘকালে যা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে, তাকে পুনরায় প্রতিস্থাপন করবার লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে সর্বব্যাপী এক সামাজিক বিপ্লব।

ইসলামের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত, যার বিচ্ছুরণ আলোকিত করবে প্রতিটি কোণ। আগামী হবে, আল্লাহ চাহে তো, ইসলাম ও মুসলমানদের। আমরা জানি রমজান এক মহান সুযোগ বয়ে আনে আমাদের জন্য, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পালটানোর এক মোক্ষম উপায় হচ্ছে রমজানকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা ; কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিবর্তন ও পরিবর্তন কেবল তখুনি আমাদের হাতে ঘটতে পারে, যখন ইখলাস, দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা, তালিম ও চরিত্র গঠনে বিপুল শ্রম নিয়োগে আমরা অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারব। একটি জাতি হিসেবে, এ ক্রমান্বয় পরিশ্রম, বিপুল কর্মযজ্ঞের দৃষ্টান্ত স্থাপন, সফলরূপে সকলের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে

দেয়ার মাধ্যমে একদিন নিশ্চয় জগতসভায় আমরা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হব।

রোজার আহকাম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে সাহাবিদের রোজা বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত করাতেন, রমজানের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন সকলকে। বিশেষভাবে তিনি সকলকে বলতেন রমজানে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে, পাপ পরিহার করে চলতে, কারণ, রমজান ও অন্যান্য সময় সমকাতারের নয়।

জ্ঞান ও চরিত্রের গঠনমূলক কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের ক্ষেত্রে এ এক কঠিন সত্য, এই দুর্বলতা হতে তারা কোনভাবেই মুক্ত নয়।

এ বিষয়ে রাসূল কতটা গুরুত্ব প্রদান করতেন, তার একটি উত্তম উদাহরণ পাই আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হাদিসে। তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন :—

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথন, সে অনুসারে আমল ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করবে না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই (আল্লাহ তাকে কোন সওয়াব প্রদান করবেন না)।[1]

অপর এক হাদিসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر.

---

[1] বোখারি : ৬০৫৭।

কেউ কেউ আছে, ক্ষুৎপিপাসাই যার রোজার ফলাফল, অনেক রাত জেগে সালাত আদায়কারী আছে, যার প্রাপ্তি কেবল রাত্রি জাগরণ।[1]

তিনি আরো বলেন : রাসূল বলেছেন—

الصيام جُنَّة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم –مرتين–

রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, সুতরাং, তাতে কটু কথা বলবে না, এবং অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করবে না। যদি কেউ তার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, কিংবা গালমন্দ করে, তবে সে বলবে : আমি রোজাদার। ...দু বার... ।[2]

ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে—

لا تسابّ وأنت صائم، فإن سابَّك أحد، فقل: إني صائم، وإن كنت قائماً فاجلس.

তুমি রোজা রেখে গালমন্দ কর না, যদি কেউ তোমাকে গালমন্দ করে, তবে বল: আমি রোজাদার। তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাক, তবে বসে পড়।[3]

আবু উবাইদা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রোজা ঢাল স্বরূপ—যতক্ষণ না তা ফুটো করা হয়। আবু মোহাম্মদ ব্যাখ্যা করে বলেন : অর্থাৎ যতক্ষণ না গিবতের মাধ্যমে তা ফুটো করা হয়। যে ব্যক্তি তার রোজাকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত-মুক্ত না

---

[1] আহমদ : ৮৮৫৬।

[2] বোখারি : ১৮৯৪।

[3] ইবনে খুযাইমা : ১৯৯৪, সূত্রটি শুদ্ধ।

রাখবে, তার রোজা অপূর্ণ। কখনো কখনো এমনকি রোজার মৌলিক উদ্দেশ্যই এতে ব্যাহত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:١٨٣].

হে মোমিনগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।[1] আয়তটি বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

উক্ত আয়াত ও হাদিস এবং এ জাতীয় অন্যান্য শরয়ি বর্ণনা হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা রমজানের রোজা, তার আদব ও আমলের মাধ্যমে আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের দিকে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা রেখেছেন। এর গূঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাকওয়া, বিনয়, আত্মসমর্পণ, আল্লাহর তরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বান্দা আপনাকে শোভিত করে তুলবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, জান্নাতের অনপনেয় নেয়ামত ও জাহান্নামের অগ্নিশিখা হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে মহান করে তুলবে তার ঐহিক ও পারত্রিক জীবন। ধৈর্য ও শয়তানের আক্রমণকে দুর্বল করে দেওয়ার ক্রমাগত অনুশীলনে নিজেকে ঋদ্ধ করবে। আত্মার নিয়ন্ত্রণ, তার লাগাম সঠিক হাতে স্থাপন, ইহকাল ও পরকালের যা কল্যাণকর ও সৌভাগ্যময়, তাতে পূর্ণ আত্মনিয়োগ, অন্তরের অন্তস্তলে আল্লাহ-ভীতি ও ধ্যান সর্বদা জাগরূক রাখা, হৃদয়কে প্রজ্বলিত রাখা, কঠোরতা দুরিকরণ, জিকির ও পরকাল চিন্তায় তাকে নিয়োগ করা, নেয়ামতের মহিমা, মানুষের মানবিক দুর্বলতা, শারীরিক ও মানসিকভাবে যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হতে দেহের মুক্তি ও সংরক্ষণ—ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবে।

---

[1] সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩।

রোজা, তাই,—ইমাম রাজির বক্তব্য অনুসারে—দম্ভ, ঔদ্ধত্য, অহংকার আর মন্দ বিষয় হতে মানুষকে বিরত রাখে, পার্থিবের আস্বাদ ও তার কর্তৃত্ব খর্ব করে। কারণ, রোজা উদর এবং যৌনাঙ্গের কামনা প্রশমিত রাখে। যে ব্যক্তি অধিক-হারে রোজা রাখবে, তার জন্য এ দুটিকে সামলানো সহজ হয়ে যাবে, বাধা প্রাপ্ত হবে এর সরবরাহ। রোজা ব্যক্তিকে হারাম ও অশ্লীল বিষয় হতে বাধা প্রদান করবে, পার্থিবের কর্তৃত্ব শিথিল করে দেবে। এসবই তাকওয়ার সমন্বয়ক।[1]

নফস—যেমন বলেছেন আবু সোলাইমান দারানি—যখন ক্ষুধার্ত হয়, আক্রান্ত হয় অসহনীয় পিপাসায়, বিশুদ্ধ হয় তখন, হয়ে উঠে তীক্ষ্ণ। আর যখন তা ভরপুর পরিতৃপ্ত থাকে, অন্ধ হয়ে যায় তখন।[2]

এই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি তার রোজাকে পূর্ণাঙ্গ করতে চায়, পেতে চায় পূর্ণ সওয়াব, আগ্রহী যে ব্যক্তি রোজার মর্যাদায় নিজেকে মর্যাদাবান করে তুলতে, তার কর্তব্য, রোজার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথারীতি জ্ঞান অর্জন করা, এ ব্যাপারে যাবতীয় আলস্য পরিত্যাগ করে কেবল সমাজ ও প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে নয় ; এবাদত করা স্বেচ্ছায়, স্বত:স্ফূর্তভাবে, বুঝে-শুনে। সামাজিক প্রচলনের বশবর্তী হয়ে এবাদত এক প্রকার অপূর্ণতা ও বিপদের সৃষ্টিকারী—শায়েখ দাউসারি মন্তব্য করেন—পরকালীন জীবনারম্ভের পূর্বেই যদি মানুষ ইলাহি নীতিমালা প্রণয়নের হিকমত সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, সজাগ না হয় তার ইহকালীন ফলাফলের ব্যাপারে, তবে তার পক্ষে একে পূর্ণতায় কিংবা বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় তুলে আনা কখনো সম্ভব হবে না।[3]

এমনিভাবে, তাকে পালন করতে হবে যাবতীয় অবশ্য পালনীয় বিধানগুলো, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বর্জনীয় কর্ম-কথা হতে পবিত্র রাখতে

---

[1] রাজি : মাফাতিহুল গায়েব : খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭০।

[2] ইবনে জাওজি, সিফাতুস সাফওয়া : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৫।

[3] ... : সিফাতুল আসার ওয়াল মাফাহিম : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৩।

হবে নিজেকে। ইখলাসকে করে তুলতে হবে পূর্ণাঙ্গ, মহীয়ান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই হবে তার একমাত্র অবলম্বন। ব্যক্তি ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি মোস্তাহাব আমল আদায়ের মাধ্যমেও তার পরকালীন প্রাপ্তিকে বৃদ্ধির প্রয়াস চালাবে। কারণ, বান্দা এর মাধ্যমে পূর্ণতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। জাবের রা. মন্তব্য করেন—যখন তুমি রোজা রাখ, তখন তোমার শ্রবণ, দৃষ্টি, ও কথাকে মিথ্যা ও পাপ হতে মুক্ত রাখ। তুমি তোমার রোজা ও পানাহারের দিবসকে সম-কাতারের করে ফেল না।[1]

আবু হুরায়রা রা. বলতেন : গিবত রোজাকে ফুটো করে দেয়, এস্তেগফার সে ফুটোতে তালি দেয়। পরবর্তী দিবসে তোমাদের যার পক্ষে রোজা রেখে ফুটো বন্ধ করা সম্ভব, সে যেন তাই করে।[2]

তরবিয়ত বিষয়ে রাসূলের হেদায়েত সম্পর্কে যার ন্যূনতম পাঠ রয়েছে, দেখতে পাবে তার নীতিমালা ও ভিত্তি গড়ে উঠেছে আন্তর নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রেখে, একেই নিরূপণ করা হয়েছে এবাদতের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে। তাই অন্তর পূর্ণতা লাভ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের মাধ্যমে। 'সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার কারণে পরিত্যাগ করেছে'[3]—হাদিসে কুদসির এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে কায়্যিম বর্ণনা করেন—রোজাদারের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য পানাহার বিষয়েই কেবল সকলে অবগত হতে পারে, অন্যথায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে পানাহার ও প্রবৃত্তি হতে নিজেকে মুক্ত রাখা এমন এক বিষয়, যা কোন বান্দাই অবগত হতে সক্ষম না। এটাই হল রোজার হাকিকত ও প্রকৃত রূপ।[4]

---

[1] ইবনে আবি শায়বা : ৮৮৮০।

[2] বাইহাকি : শুআবুল ঈমান : ৩৬৪৪।

[3] মুসলিম : ১১৫১।

[4] যাদুল মাআদ : ইবনে কায়্যিম : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯।

সুতরাং, বর্তমান সময়ে চরিত্র ও অভ্যাস গঠনমূলক অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই আমরা দেখতে পাই, বাহ্যিক গঠনের প্রতিই কেবল জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে আরোপ করা হচ্ছে নানারূপ কঠোরতা, পাপ ও অপরাধের যা প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে কেবল তার প্রতি। অন্যদিকে যা বান্দার আন্তর সম্পর্কিত, সম্পর্কিত তার পাপ ও সওয়াবের সাথে, তার প্রতি প্রদর্শিত হচ্ছে সীমাহীন দৌর্বল্য ও আলস্য। রাসূলের বিভিন্ন হাদিস দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, আন্তর সম্পর্কিত বিষয়ই মূলত: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধতা ও বিনষ্টের গভীরতার মাপকাঠি।

হাদিসে এসেছে, রাসূল বলেছেন—

ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب.

নিশ্চয়, দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ভাল থাকে, ভাল থাকে পুরো দেহ। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় পুরো দেহ। শোন, তা হচ্ছে অন্তর।[1] আন্তর বিষয়ের প্রতি এভাবে উদাসীন থাকা বোকামি ব্যতীত কিছু নয়। আত্মিক সমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে, কেননা, অন্তরের বিনয়, কথায় ও কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর তরে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। আল্লাহর ভালোবাসা ও মহত্ত্ব সঞ্জাত এ বিনয় যখন অর্জিত হবে, নিশ্চয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাকে অনুসরণ করবে।

আত্মিকভাবে স্বত:প্রণোদিত হয়ে, স্বত:স্ফূর্তভাবে পাপ ও অপরাধ ত্যাগ করার মাধ্যমেই কেবল আত্মার পরিশুদ্ধিতে সাফল্য লাভ সম্ভব। মানুষের আন্তর বিষয়গুলো তার সর্বোচ্চ মনোযোগ প্রাপ্তির অধিকারী। এভাবে, মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমত, বরকত ও বিশেষ দৃষ্টির মাধ্যমে সফল হয়ে উঠবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এরশাদ করেছেন—

---

[1] বোখারি : ৫২।

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহ্যিক প্রতিমূর্তি ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তাকান অন্তর ও কর্মের প্রতি।[1]

রমজান হচ্ছে এ ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধনের সুবর্ণ সুযোগ। নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক বা ব্যক্তিক যে উপায়েই তা সংঘটিত হোক না কেন, উম্মতের জন্য তা বয়ে আনবে সমূহ কল্যাণ ও প্রাপ্তি।

নববি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু রীতি ও ধারা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যা চরমভাবে রোজার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কেউ কেউ রোজার ওজর পেশ করে সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন না, বরং, বিষয়টি কখনো কখনো এতদূর গড়ায় যে, কেউ কেউ সালাতই ত্যাগ করে বসে ! সালাত হচ্ছে রোজা ও যাকাতেরই সমকাতারের—বরং, তার তুলনাতেও অধিক ফজিলতপূর্ণ। যে ব্যক্তি একে সহজভাবে নিবে, সে অবশ্যই বিপদাপন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

ব্যক্তি এবং শিরক-কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী হচ্ছে সালাত ত্যাগ।[2]

অপর স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :—

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গিকার হচ্ছে সালাত, যে তা ত্যাগ করবে, সে কাফেরে পরিণত হবে।[1] অপর হাদিসে রাসূল সালাত অস্বীকারকে নয়, ত্যাগ করাকেই কুফরে প্রবেশের কারণ বলেছেন।[2]

---

[1] মুসলিম : ২৫৬৪।

[2] মুসলিম : ৮২।

ওয়াজিব আদায়ে যদি কারো অপূর্ণতা থেকে যায়, কিংবা স্খলন ঘটে কোন প্রকার, তাহলে দেখা যায়, কোন কোন মূর্খ একে রোজা ভঙ্গের কারণ হিসেবে ঘোষণা করেন। এ ক্ষেত্রে তার অনুসরণীয় হচ্ছে ইবনে হাযম-এর মত আহলে জাওয়াহেরগণ, কিংবা যে মনে করে যে, যে-কোন পাপের কারণে রোজা বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ—তাদের মত—রোজা রেখে পাপের ফলে সঠিক উপায়ে রোজা রাখা হয় না, পালিত হয় না ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা রোজা পালনের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[3]

এ খুবই বিভ্রান্তিকর একটি ফতওয়া। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, রোজা পালনকালীন পাপ করলে সওয়াব কমে যায়, বরং কখনো কখনো সওয়াব বিনষ্টই হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে রোজা বাতিল হয়ে যায় না, এবং কাজাও ওয়াজিব হয় না।

লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানে উৎসাহ প্রদান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে। রাসূল এ মহান রাত্রিকে গনিমত মনে করে কাজে লাগাতে

---

[1] তিরমিজি : ২৬২১, হাদিসটি সহি।

[2] আল্লামা ইবনে উসাইমিন তার ফাতাওয়া গ্রন্থে (খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৮৭) এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়া প্রদান করেছেন। তার মন্তব্য : যে ব্যক্তি রোজা রেখে সালাত আদায় করে না, তার রোজা কোন কাজে দিবে না, তার রোজা কবুল হবে না। সে তার জিম্মা হতে মুক্তি পাবে না, বরং, সালাত আদায় না করলে তার উপর এ দায় থেকে যাবে। কারণ, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে ইহুদি ও নাসারার মত হয়ে যায়। কোন ইহুদি কিংবা নাসারা যদি রোজা রাখে, তা কি কবুল করা হবে ? তোমার কি মত ? নিশ্চয় তার রোজা কবুল করা হবে না। সুতরাং, তুমি সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তওবা কর, এবং রোজা রাখ। যে আল্লাহর কাছে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

[3] দ্র : মুহাল্লা : ইবনে হাযম, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৮।

বলতেন, এর কল্যাণ অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতেন সকলকে। একবার তিনি সাহাবিদেরকে এ রাতের ফজিলত বর্ণনা করে বলেন :—

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি ইমান ও ইহতেসাবের সাথে এ রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[1]

ভিন্ন হাদিসে রাসূল এ রাতের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন :—

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

রমজানের শেষ দশ দিনে তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর।[2]

বেজোড় সংখ্যক রাত্রির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় সংখ্যক রাতে তোমরা লাইলাতুর কদর অনুসন্ধান কর।[3]

তবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা দুর্বল ও অসুস্থ, তাদের ক্ষেত্রে কেবল শেষ সাত রাত্রিতে অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছেন। এক হাদিসে রাসূল বলেছেন—

التمسوها في العشر الأواخر – يعني ليلة القدر –، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.

তোমরা শেষ দশে তা, অর্থাৎ লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর। যদি তোমাদের কেউ দুর্বল হয়, কিংবা অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে শেষ

---

[1] বোখারি : ১৮০২।

[2] বোখারি : ২০২০।

[3] বোখারি : ২০১৭।

সাতে যেন পরাভূত হয়ে না পড়ে (শেষ সাত রাতে অবশ্যই যেন তালাশ করে)।[1]

রাসূল, অত:পর শেষ সাত রাত্রির মাঝে লাইলাতুল কদরের জন্য সর্বাধিক সম্ভাবনাময় রাত্রি হিসেবে সাতাশের রাত্রিকে নির্ধারণ করেছেন, তিনি এক হাদিসে এরশাদ করেছেন—

من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين، وقال: تحروها ليلة سبع وعشرين، يعني: ليلة القدر.

যে তা (লাইলাতুল কদর) অনুসন্ধান করবে, সে যেন অনুসন্ধান করে সাতাশের রাতে। এবং তিনি বলেছেন—তোমরা তা অর্থাৎ লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর সাতাশের রাতে।[2]

এ জাতীয় নানা হাদিস বর্ণিত হওয়ার কারণেই সাহাবি উবাই বিন কাব রা. শপথ করে বলতেন যে, তা সাতাশের রাত্রিতেই ঘটে। তিনি বলেন :—

والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين.

আল্লাহর শপথ ! আমি তার ব্যাপারে অবগত। আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, তা হল, সেই রাত্রি, যাতে রাত যাপনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তা হচ্ছে সাতাশের রাত্রি।[3]

মূলত: কিছু কিছু বছরে সাতাশের রাত্রিতে লাইলাতুল কদর ঘটেছিল, এবং সাহাবিগণ এ রাতের ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা পোষণ

---

[1] মুসলিম : ২৮২২।

[2] আহমদ : ৬৪৭৪।

[3] মুসলিম : ১৮২২।

করতেন। তবে, একুশের রাত ও তেইশের রাতেও লাইলাতুল কদর হয়েছে—এমন প্রমাণও হাদিসে পাওয়া যায়।

একুশের রাতের প্রমাণ হল :—আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أُتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال: وإني أُريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين.

আমি (প্রথমে) এ রাতের সন্ধানে প্রথম দশে এতেকাফ পালন করি। অত:পর এতেকাফ পালন করি মাঝের দশে। পরবর্তীতে ওহির মাধ্যমে আমাকে জানানো হয় যে, এ রাত শেষ দশে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে (এ দশে) এতেকাফ পালনে আগ্রহী, সে যেন তা পালন করে। লোকেরা তার সাথে এতেকাফ পালন কর। রাসূল বলেন—আমাকে তা এক বেজোড় রাতে দেখানো হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, আমি সে ভোরে কাদা ও মাটিতে সেজদা দিচ্ছি। অত:পর রাসূল একুশের রাতের ভোর যাপন করলেন, ফজর পর্যন্ত তিনি কিয়ামুল্লাইল করেছিলেন। তিনি ফজর আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তখন আকাশ ঝেপে বৃষ্টি নেমে এল, এবং মসজিদে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি পড়ল। আমি কাদা ও পানি দেখতে পেলাম। ফজর

সালাত শেষে যখন তিনি বের হলেন, তখন তার কপাল ও নাকের পাশে ছিল পানি ও কাদা। সেটি ছিল একুশের রাত।[1]

আব্দুল্লাহ বিন আনিস বর্ণিত হাদিস দ্বারা আমরা তেইশের রাত্রি সম্পর্কে জানতে পারি, তাতে আছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

أُريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.

প্রথমে আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হলেও পরে আমি তা বিস্মৃত হয়ে যাই। আমাকে দেখানো হয়েছিল যে, সে ভোরে পানি ও কাদায় আমি সেজদা দিচ্ছি। রাবি বলেন, তেইশের রাতে আমরা বৃষ্টিস্নাত হলাম, রাসূল আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং প্রস্থান করলেন। তার কপাল ও নাকে ছিল পানি ও কাদার চিহ্ন।[2]

এ সকল বর্ণনা ও বিভিন্ন মতের মাধ্যমে আমরা অবগত হই যে, লাইলাতুল কদরকে গোপন করা হয়েছে, এবং শেষ দশের বেজোড় রাতগুলোতে—নির্দিষ্ট এক রাতে নয়, ভিন্ন ভিন্ন রাতে উপস্থিত হয়। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে রহমত ও এহসান স্বরূপ কখনো এক রাতে, কখনো ভিন্ন রাতে তা হাজির হয়। আমলে আকাঙ্ক্ষী ও উদাসীনদের মাঝে এক সরল পার্থক্য রেখা টেনে দেয়।

সাহাবিদের জীবনাচার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে বিচার করবে, দেখতে পাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসারীদেরকে যার মাধ্যমে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে সর্বাধিক উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছেন, তাহল, কর্মের মাধ্যমে মূর্ত আদর্শ

---

[1] বোখারি : ২০১৮।

[2] মুসলিম : ২৮৩২।

সকলের সামনে তুলে ধরা। রাসূল যে রাতকে ভাবতেন লাইলাতুল কদর হিসেবে, তার কাছে মনে হত যে, এ রাতই প্রতিশ্রুত লাইলাতুল কদর, সে রাতে তিনি কঠিন পরিশ্রম করতেন, নানাভাবে এবাদতে কাটিয়ে দিতেন, তাই সাহাবিগণ সরাসরি রাসূলের সংস্পর্শে সে রাত যাপন করতেন এবং উৎসাহিত হতেন এ ব্যাপারে। প্রকাশ্যে রাসূলের এ পরিশ্রম ও মোজাহাদার কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন উম্মতের সকলের জন্য অনুসরণীয় ও ইমাম। লাইলাতুল কদর হচ্ছে এমন রাত, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে রাতের আমল হাজার বছরের আমলের তুলনায় অধিক সওয়াব আনয়নকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন—এ রাতে আকাশের ফেরেশতা ও জিবরাইল আঃ মর্ত্যলোকে নেমে আসেন, এবং তা শান্তি ও নিরাপত্তার রাত, বিপুলভাবে এ রাতে তিনি বান্দাদের মর্যাদা ও করুণায় ভূষিত করেন, ক্ষমা করেন তাদের, মুক্ত-বিধৌত করেন পাপ ও গোমরাহির ক্লেদাক্ততা হতে।

বর্তমান সময়ে এ রাত সংক্রান্ত মানুষের আবেগ ও অনুভূতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, অধিকাংশ মানুষই এ রাতে নিজেকে কল্যাণ-কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে উদ্যমী হয়, আগ্রহ বোধ করে বিপুলভাবে, এ রাতের রহমত-বরকত ও করুণা লাভের মাধ্যমে নিজেকে ভূষিত-সুরভিত করতে প্রয়াস চালায়। তবে, সাধারণ মানুষের এ আবেগ ও অনুভূতি, সৎকাজে ক্রমাগত নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার আগ্রহ তখনি সঠিক উপায়ে, বিশুদ্ধ গতিতে সুফল পরিণামে পর্যবসিত হবে, যখন আলেম ও মুসলিহ, এবং দায়িগণ তাদের জন্য উপস্থাপন করবেন কর্মের মূর্ত এক আদর্শ। রাসূল হতে বর্ণিত-সাব্যস্ত আমলগুলো তারা তাদের সামনে তুলে ধরবেন, এ অনুসারে আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন সকলকে। বিচ্যুতি ও প্রমাদগুলো সংশোধন করে, এবং উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে যাতে মানুষ আমল করতে পারে—এ ব্যাপারে আলেমগণ সবিশেষ দৃষ্টি প্রদান করবেন।

যে পদ্ধতি ও নববি পন্থা অনুসরণ করে আমরা এ বিষয়ে নিজেদের ও সকলকে গড়ে তুলতে পারি, তা নিম্নরূপ :—

* যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে এ রাতের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়, তার পূর্ণ রূপায়ণ : যেমন—দিবসে বিশ্রামে যাপন, অনর্থক সংশ্রব এড়িয়ে নীরবে সময়টি যাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ, এতেকাফে না থাকলে দ্রুত মসজিদমুখী হওয়া, স্বল্পাহার, পারিবারিক প্রয়োজন পুরণ—যেমন শেষ দশ আগমনের পূর্বে ঈদ সংক্রান্ত যাবতীয় কেনাকাটা সম্পন্ন করা ইত্যাদি।

* পাপ ও গোমরাহি হতে আত্মায় ও মননে পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হওয়া। এ জন্য যাবতীয় কবিরা গোনাহ হতে পরিপূর্ণরূপে তওবা করে নিবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিস—

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ইমান ও ইহতেসাবের সাথে রমজান যাপন করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ইমান ও ইততেসাবের সাথে লাইলাতুল কদরের রাত্রি যাপন করবে, তারও পূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[1]—বর্ণনার পাশাপাশি এও এরশাদ করেছেন যে—

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اُجتُنب الكبائر.

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা হতে অপর জুমা, এক রমজান হতে অপর রমজান মধ্যবর্তী সকল পাপের কাফ্‌ফারা—যদি কবিরা

---

[1] আহমদ : ৯৪৫৯।

গোনাহ হতে বেঁচে থাকা হয়।[1] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে কবিরা গোনাহ হতে বেচে থাকার উপর নির্ভরশীল রেখেছেন।

* আল্লাহ প্রেম, তার মহত্ত্ববোধ, আত্মিক ও বাহ্যিক জগতে তার কর্তৃত্বের
বিস্তৃতি, তার ভীতি, তার ফজিলত ও এহসানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি, নেয়ামতের বিপুলতা, শাস্তির ভয়াবহতা—ইত্যাদি বোধ ও চেতনার মাধ্যমে নিজেকে ভরিয়ে তোলা। আল্লাহই হচ্ছেন বান্দার শেষতম শরণ ও আশ্রয়। বান্দা যে পরিমাণ নিজেকে আল্লাহর তরে নতজানুরূপে পেশ করতে পারবে, উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব, জানতে পারবে তার পরিচয়, ঠিক সে পরিমাণেই তার আমল কবুল হওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, এবং পুরস্কার লাভ করবে বহু গুণে। সুতরাং, যে ব্যক্তি বাহ্যিক আমলেই নিজেকে সন্তুষ্ট করে রেখেছে, আন্তর সম্পর্কিত আমলে নিজেকে বিন্দুমাত্র জড়াইনি, হে মুসলিম ভাই ! তার সমকাতারভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাও !

* কোন কোন আলেমের পক্ষ হতে গোসল করা, সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার সংক্রান্ত যে বর্ণনা পাওয়া, তা অনুসরণ করা যেতে পারে। ইবনে জাওযি বলেন : সালফে সালিহীনগণ এ রাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তামিম দারি যে রাতকে লাইলাতুল কদর মনে করতেন, সে রাতে এক হাজার দেরহামের পোশাক পরিধান করতেন। এমনিভাবে, সাবেত ও হামিদ এ রাতে গোসল করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন।

* নিজের জন্য এ রাতে সর্বোত্তম আমল নির্বাচন, যে আমল বান্দাকে ক্রমান্বয়ে বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে। আন্তর ও বাহ্যিক আমলগুলোর রয়েছে নানা স্তরক্রম—ভীতি, বিনয় বিনম্র আচরণ, আল্লাহর তরে নিজেকে বিলীন করে উপস্থাপন ইত্যাদির

---

[1] মুসলিম : ২৩৩।

মাধ্যমে মানুষের কাছে এমন কিছু উন্মোচিত হয়, যা আমরা অন্য কোথাও পাই না।

* রমজানের পুরোটা সময়েই বান্দা রাত যাপনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। কেবল লাইলাতুল কদরকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি ইমান ও ইহতেসাবের সাথে রমজানে রাত যাপন করবে, আল্লাহ পাক তার পূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন।[1]

আমলের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের রাতগুলোতে তারতম্য করতেন—বিষয়টিকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করি না ; কারণ আয়েশা রা. রাসূলের রমজানের রাত্রিকালীন আমলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশে এতটা পরিশ্রম করতেন, যেমন করতেন না অন্য সময়ে।[2]

—এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশের রাতগুলোতেও আমলের মাঝে তারতম্য করতেন ; আবু যর রা. হতে বর্ণিত হাদিসে বিষয়টি স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। তিনি বর্ণনা করেন—

صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة

---

[1] বোখারি : ৩৭।

[2] মুসলিম : ২৮৪৫।

لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يارسول الله: لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: ما الفلاح؟، قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر.

আমরা রাসূলের সাথে রমজানে সিয়াম পালন করেছি, সাত দিবস অবশিষ্ট থাকা অবধি তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রি জাগরণ করলেন না। (সপ্তম রাত্রিতে) তিনি আমাদের নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ অবধি রাত জাগরণ করলেন। ষষ্ঠ রাত্রিতে তিনি আমাদের নিয়ে রাত যাপন করলেন না। পঞ্চম রাত্রিতে তিনি অর্ধ রাত্রি অবধি সালাতে কাটালেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! পুরো রাতই যদি আপনি আমাদের নিয়ে নফল আদায় করতেন ! আবু যর বলেন, রাসূল বললেন : ইমাম প্রস্থান করা অবধি যে ব্যক্তি তার সালাত আদায় করে, তার জন্য পুরো রাত যাপনের সওয়াব লিখে দেয়া হয়। অত:পর চতুর্থ রাত্রিতে তিনি আমাদের নিয়ে যাপন করলেন না। তৃতীয় রাত্রিতে তিনি তার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-গণ ও লোকদের সকলকে একত্রিত করলেন এবং আমাদের নিয়ে এতটা সময় রাত্রি জাগরণ করলেন যে, সেহরির সময় অতিক্রান্তের ভয় হল।[1]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংখ্যা তারতম্যই এখানে মুখ্য বিষয় নয়। বরং, যাবতীয় কল্যাণ নিহিত সংখ্যায় ও পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুবর্তনে। মানুষ, বরং, হারাম কর্মে যোগদান এবং ওয়াজিব আমল বিনষ্টের মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে বিপদে। জামাত ত্যাগ, অনর্থক কাজে সময় ব্যয়, সুন্নত ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা পরিত্যাগ, কোরআন

---

[1] আবু দাউদ : ১৩৭৭০, হাদিসটি সহি।

তেলাওয়াত ও তার অনুশীলন বর্জন, আত্মিক উন্নয়নে অবহেলা, জিকির, দোয়া, সদকা ও অন্যান্য সৎকাজে অবহেলা—মূলত: এগুলোই মানুষকে সত্য পথ বিচ্যুত করে নিপতিত করে অন্ধকারের গহিনে। এমনকি, কারো কারো রমজানে আসে কোন প্রকার বিশেষত্বহীনভাবে, অন্য কোন সময়ের সাথে কোন পার্থক্য বা তারতম্য নেই। এবং মানুষের এ সকল মনোবৃত্তির উপস্থিতি হয় সময়ের গুরুত্বহীনতা, সুযোগ হাতছাড়া করা, সালফে সালেহিনের বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়া, সর্বোপরি, যারা রমজানের পুরো সময়টিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে নিজের দ্বীনী জীবনকে পূর্ণাঙ্গ আলোকিত করে তুলতে চায়, তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। সন্দেহ নেই এ খুবই গর্হিত কর্ম।

যাদের মাঝে এ সকল মনোবৃত্তির উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাদের মনে রাখতে হবে রাসূলের এক ভয়াবহ উক্তি তাদের সামনে খড়্গ হয়ে ঝুলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বরে আরোহণ করছিলেন। তিনি আপাত এক অদ্ভুত উক্তি করেন : হাদিসটিতে আছে—

فلما ارتقى درجة قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه!، قال: إن جبريل عرض لي فقال: بُعْدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بُعْدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بُعْدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يُدخلاه الجنة، قلت: آمين.

অত:পর যখন তিনি আরেকটি স্তরে উন্নীত হলেন, বললেন, আমিন! দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়ে বললেন, আমিন ! তৃতীয় স্তরে উন্নীত হয়েও বললেন আমিন ! যখন তিনি নেমে এলেন, আমরা বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল ! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু শ্রবণ করেছি, যা ইতিপূর্বে শ্রবণ করিনি। তিনি বললেন : জিবরাইল আমাকে বললেন : যে ব্যক্তি রমজান পেয়েছে অথচ তাকে ক্ষমা করা হয়নি, সে ধ্বংস হোক, আমি তার এ কথার প্রেক্ষিতে বলেছি আমিন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেছি, তখন সে বলল, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হল, অথচ সে আপনার উপর সালাত পাঠ করল না। আমি উত্তরে বললাম আমিন। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে জিবরাইল বললেন : ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে লাভ করেছে, অথচ তারা তার জান্নাত লাভের কারণ হয়নি। আমি বললাম, আমিন।

এ হাদিসটি রমজান অবহেলায় যাপনকারীদের জন্য এক অশনি সংকেত—সন্দেহ নেই। আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ লাইলাতুল কদর বলতে কেবল সাতাশের রাতকেই বুঝেন। বিশুদ্ধ মত অনুসারে, অথচ, লাইলাতুল কদর কেবল সাতাশের রাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে, অন্যান্য রাতের তুলনায় এ রাতের ব্যাপারে প্রবল ধারণা পোষণ করা যায়।

আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ লাইলাতুল কদর হিসেবে সাতাশের রাতকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, যা এক প্রকারে

নিষিদ্ধ কর্মে বাঁধা দান

তার প্রমাণ :—

أن رسول الله صلي الله عليه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة.

জাবের (রা:) এর হাদিস—আমুল ফাতাহ–বিজয়ের বছর রাসূল যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, রাসূল (সা:) তখন 'কিরাউল গামীম' পৌঁছা পর্যন্ত রোজা রাখলেন। তার সাথে অন্যরাও রোজা রাখল। অত:পর তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে, সবাই দেখতে পায় এমনভাবে উঁচু করে পান করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, কেউ কেউ তো রোজা রেখেছে ! তিনি বললেন : 'তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য'।[1]

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে সফরে রোজা জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল তা থেকে বাধা দিচ্ছেন। এর দুটি কারণ হতে পারে : এই কাজ ছিল মানুষের জন্মজাত স্বভাব উপযোগী আদেশের বিরোধী কিংবা তখন রোজা রাখা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টকর হতে পারত।[2] এইভাবে উত্তম না হওয়ার ফলেই একটি জায়েজ আমল থেকে যখন রাসূল এইভাবে বাধা দিচ্ছেন তখন তা থেকে অতি সহজেই বুঝা যায়, প্রতি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে : সাধ্য অনুসারে ভাল কাজের প্রচার-প্রসার করা এবং এই মহান মাসকে ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো থেকে পবিত্র রাখা, যেগুলো অনেক সময় শুধুই ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা ছোট-খাটো কোন অপরাধ থাকে না। বরং পরিকল্পিত ও সচেতন ইচ্ছেজাত অপরাধ হয়ে উঠে। প্রতিটি মুসলমানকেই এই কাজটি করতে হবে। কারণ আমাদের রাসূল আদেশ করেছেন :—

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

অর্থাৎ—তোমাদের কেউ যখন কোন অপকর্ম দেখে তখন সে যেন কর-জোর প্রয়োগ করে তাকে বদলে দেয়, যদি তা না পারে তাহলে

---

[1] মুসলিম : ১১১৪।

[2] দ্র : ইমাম নববী লিখিত মুসলিমের ব্যাখ্যা : খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৩২।

যেন মুখের ভাষায় তার প্রতিবাদ করে। যদি তাও না পারে তাহলে মনে মনে তার প্রতিবাদ করে।[1]

[1] মুসলিম : ১৯।

না-ছোড়দের শিক্ষাদান

এটা মূলত শিক্ষাদান ও চরিত্র প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ শৈলী, প্রজ্ঞাবান প্রশিক্ষক অনেক সময় যা অবলম্বন না করে পারেন না।

তার প্রমাণ : উমর বিন আবু সালামা (রা:) এর হাদিস—

أنه سأل رسول الله صلي الله عليه و سلم أيقبل الصائم؟، فقال له رسول الله صلي الله عليه و سلم: سل هذه «لأم سلمة»، فأخبرته أن رسول الله صلي الله عليه و سلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله:: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোজাদার কি (স্ত্রীকে) চুম্বন করতে পারবে ? তিনি বললেন, উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস কর। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে থাকেন। তখন সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন !! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'জেনে রাখ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও আল্লাহ-ভীরু।'[1]

তার আরেকটি প্রমাণ :—

نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له: رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟، قال: وأيكم مثلي؟!، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً

---

[1] মুসলিম : ১১০৮।

ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر لزدتكم!» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

আবু হুরায়রা (রা:) এর হাদিস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ছওমে ওসাল' বিরামহীন (মাঝে ইফতার ও সেহরি না খেয়ে রোজা রাখা) রোজা রাখতে নিষেধ করলেন। তখন এক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি তো তা করে থাকেন। উত্তরে তিনি বললেন 'তোমাদের কে আমার মত ? রাতে আমার রব আমাকে পানাহার করান'। এরপরও যখন তারা লাগাতার রোজা থেকে বিরত থাকল না তখন তিনি তাদের নিয়ে লাগাতার রোজা রাখতে থাকলেন, এক দিন তারপর আরেক দিন। তৃতীয় দিন চাঁদ দেখা গেল। তখন, যারা সওমে ওসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করেছিল তাদের ভর্ৎসনা করে বললেন : যদি চাঁদ উঠতে আরো বিলম্ব হত তাহলেও তোমাদের নিয়ে আরো ওসাল করতাম'।[1]

এর আরেকটি প্রমাণ : আনাস (রা:) এর হাদিস :—

فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه و سلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي!، أما والله لو تَمَادَّ لَي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم.

'...তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসাল করতে লাগলেন। ব্যাপারটি ঘটল মাসের শেষ দিকে। তখন তাঁর দেখাদেখি কিছু সাহাবিও ওসাল শুরু করলেন। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু বললেন, এই লোকদের ব্যাপারটা কি, তারা ওসাল শুরু করল কেন ? তোমরা তো আমার মত নও। আল্লাহর কছম ! যদি মাস দীর্ঘ হত

[1] বোখারি : ১৯৬৫।

তাহলে আমি ওসাল করে যেতাম যাতে না-ছোড়রা তাদের না-ছোড়ামী ছেড়ে দিতে বাধ্য হত'।[1]

ইসলামি শরিয়ত মূলত সহজ ও অনায়াস সাধ্য শরিয়ত। তার একটি প্রধান মূলনীতি হচ্ছে, সহজতা, কঠিনতা দূর করা, সহমর্মিতা প্রদর্শন। এই ক্ষেত্রে অনেক 'নস' পাওয়া যায়। 'এই দ্বীন নিয়ে যারা বাড়া-বাড়ি করে দ্বীন নিজেই তাদের উপর প্রবল হয়ে যায়'।[2]

এটি মূলত রাব্বানি, ঐশী দ্বীনের বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের বাস্তবতা এবং প্রাকৃতিক স্বভাবের প্রতি লক্ষ রেখে প্রণীত। এবং এই দ্বীনকেই আল্লাহ কেয়ামত অবধি বহাল রাখতে চান। আমাদেরকে এই মহান নেয়ামতে ভূষিত করার জন্য আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া।

সওমে ওসাল নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভর্ৎসনা মূলত: এই মূলনীতির উপর নির্ভর করেই করা হয়েছে। কারণ রাসূল দেখেছিলেন এই রোজা সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু যখন কারো কারো বেলায় মৌখিক ভর্ৎসনা ব্যর্থ হল তখন মৃদু শাস্তির প্রয়োজন পড়ল। তবে মনে রাখতে হবে, এই শাস্তি কোন হারাম কাজের জন্য ছিল না। কারণ যদি হারামই হত তাহলে তা সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও করতেন না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার উপর তাদের বহাল রাখতেন না। বরং তা ছিল একটি জায়েজ এবাদত। তবে তা তাদের জন্য কষ্ট সাধ্য ছিল। তারপরও যখন তারা তা করতে চাইলেন তখন রাসূল তা আরো বেশি করে করতে দিলেন যাতে তারা নিজেদের সাথে রাসূলের পার্থক্য বুঝতে পারে। এইভাবে অভূতপূর্ব এক সহমর্মীপ্রবণ ও মমতাময়ী পদ্ধতিতে রাসূল বিষয়টির সমাধান করেন।

[1] মুসলিম : ১১০৪।

[2] বোখারি : ৩৯।

ফিতরা আদায়ের আদেশ

তার প্রমাণ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিসে আছে–

فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

ইবনে উমর (রা:) এর হাদিস : তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা নির্ধারণ করলেন এক সাআ' খেজুর বা এক সাআ' জব। তিনি স্বাধীন, দাস, নারী-পুরুষ সবার উপর ফেতরা ওয়াজিব করলেন। এবং ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করার আদেশ দিলেন।[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রা:)-এর হাদিস, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুই দিন পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি তাতে বললেন, তোমারা দুই জনের জন্য এক সাআ' গম বা প্রতি জনের জন্য এক সাআ' খেজুর বা এক সাআ' জব আদায় কর, ছোট বড় সবার পক্ষ থেকে।[2]

আবু সাঈদ খুদরি (রা:) এর হাদিস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের দিন আমরা এক সাআ' খাবার দান করতাম। তিনি বলেন, আমাদের সেই খাদ্য ছিল জব, কিসমিস, খেজুর এবং পনির।[3]

---

[1] বোখারি :১৫০৩।

[2] আবু দাউদ : ১৬২১, আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭৮৫।

[3] বোখারি : ১৪৩৯।

ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদিস, তিনি বলেন রোজাদারকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য এবং মিসকিনদের আহারের ব্যবস্থার লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করবে তারটাই নির্ধারিত জাকাতে আদায় বলে বিবেচিত হবে। আর কেউ যদি তার পর আদায় করে তাহলে তা সাধারণ ছদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।[1]

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সালাত হয়ে যাওয়ার পর ঈদের কথা জানতে পারে বা জাকাত আদায় কালে সে পল্লিতে (যেখানে ঈদের নামাজ হয় না) কিংবা সেই সময় সে এমন কোন স্থানে থাকে যেখানে জাকাতের অধিকারী কেউ নেই, তাহলে নামাজের পর যখন তার পক্ষে সম্ভব হয় তখন আদায় করলেই হবে। কারণ এতটুকই তার সাধ্যের মধ্যে আছে। রহমান আল্লাহ কারো উপরে তার সাধ্যের অধিক কোন কিছু চাপিয়ে দেন না।[2]

আমাদের এই কালে নিঃসন্দেহে মুসলমানদের দান ও বিভিন্ন ভাল কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই বিধানটি তার সঠিক ও শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়ের ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা রয়েছে। তাই দায়িদের উচিত এই ক্ষেত্রে সময় দেওয়া, এই বিধান পালনে উৎসাহিত করা এবং তা আদায়ের সঠিক সময় ও পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেয়া। তাহলেই তার যে লক্ষ্য তা বাস্তবায়িত হবে : ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়বে ধনী-দরিদ্র প্রতিটি মুসলিম পরিবারের মাঝে।

তারাবীহ নামাজের রাকাতের মত এটি একটি বাৎসরিক বিতর্কিত মাসআলা। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সম্ভবত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :—

---

[1] ইবনে মাজা : ১৮২৭, হাদিসটি হাসান।

[2] দ্র : মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১১২।

১. বিরোধী চিন্তাকে—যারা নগদ টাকায় ফেতরা আদায়ের কথা বলেন—উদারভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা চর্চা করা। আমাদের বুঝতে শিখতে হবে যে, যারা এই ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করছেন তারা—যদিও আমরা এর বিপরীত মতটাকেই সঠিক মনে করছি—মূলত একটি নির্দিষ্ট চিন্তা-যুক্তি থেকেই তা বলছেন এবং তাদেরও উদ্দেশ্য জাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে শরিয়তের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। জাকাতুল ফিতর নিয়ে বিতর্ক অনেক পুরোনো এবং সম্পূর্ণভাবে তা দূর করা সম্ভব নয় এবং তা আমাদের লক্ষ্য হওয়াও উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কর্মপন্থা হচ্ছে জ্ঞান সাধক তার নিকট যে মতটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য প্রমাণসিদ্ধ মনে করে সে তাই গ্রহণ করবে এবং যে কোন বিরোধী মতকে উদারতার সাথে গ্রহণ করবে এবং সবাই মিলে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিতর্কের অনিষ্ট থেকে উদ্ধার করা এবং শরিয়তি এবাদতগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মুসলিম শরিয়া বিশেষজ্ঞদের প্রতি সাধারণের আস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। এ ছাড়া অর্থহীন, মন-মানসিকতা বিনষ্টকারী যে সব বিতর্ক হয় তাতে জড়িয়ে কোন লাভ নেই। এই সব বিতর্ক আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। অনেক সময় তা বরকত থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে উঠে। আমাদের মনে রাখা উচিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শবে কদর নিয়ে দুই ব্যক্তির ঝগড়ার কারণ এই সংক্রান্ত জ্ঞানকে ঊর্ধ্বাকাশে চির দিনের জন্য তুলে নেওয়া হয়েছিল।

২. যে নিরাপদ ও বিতর্ক মুক্ত থাকতে চায় এই ক্ষেত্রে তার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তার নিজ দেশে প্রচলিত খাবার দ্বারা ফিতরা আদায় করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন এবং এই ক্ষেত্রে কারো কোন বিতর্ক নেই। পক্ষান্তরে নগদ টাকায় আদায় করলে হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

৩. সাদকায়ে ফিতরের যে লক্ষ্য—ঈদের দিনে দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের আনন্দে সহযোগিতা করা, সদকা

আদায়ের সময় তার প্রতি মনোযোগী থাকা উচিত। দরিদ্রদের চাহিদা এবং প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মত খাবার দান করার দ্বারা এই লক্ষ্য অনেক সময় বাস্তবায়িত হয় না। এর মাধ্যমে নি:সন্দেহে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু তা সদকার মূল লক্ষ্য পূরণ করছে না, তাই তা উত্তম হওয়ার কথা নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

অনুরূপ নিম্নমানের খাদ্য দানের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় না। এই ক্ষেত্রে মিসকিনরা তা ব্যবসায়ীর নিকট বা অন্যান্য সদকা দানকারীদের নিকট সেই খাদ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। ফলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হয় এবং ঈদের দিনে দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণের যে লক্ষ্য ছিল তা অনর্জিত থেকে যায়।

এই ভুলের উৎস হচ্ছে সদকার জন্য সঠিক ও উপযোগী খাদ্য নির্বাচন ও তার ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা। যদি দানকারীরা সঠিক উপযোগী খাদ্য দ্বারা সদকা আদায় করত তাহলে অবশ্যই খাদ্য দ্বারা সদকা করার নানা হিকমত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

৪. জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূল বিধান হচ্ছে নিজেদের দেশ-মহল্লাতেই তা আদায় করা। অন্য কোন দেশ বা নিজ দেশেরও অন্য কোন এলাকায় তা পাঠানো উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে যে নির্বাধভাবে তা করা হয় তা সঠিক পদ্ধতি নয়। যদি নিজ দেশে জাকাতের আদায়ের মত দরিদ্র না থাকে তাহলে আমরা বলি অন্য দেশ বা এলাকায় তা পাঠানো যায়। তবে এই ক্ষেত্রে শরিয়তি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং সঠিকভাবে তা আদায় করার জন্য বিশ্বস্ত হাতে তা অর্পণ করা উচিত।

৫. অনেক ব্যক্তি যে জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবা সংস্থাকে উকিল নিয়োগ করেন, সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় কিছু ভুল করা হয়। যেমন উক্ত সংস্থা মিসকিনের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তা গ্রহণ করেন না বরং তিনি হন আদায়ের ক্ষেত্রে দানকারীর উকিল। এর প্রমাণ, আদায়ের সময় তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করতে পারেন।

মাসআলার বিচারে এই ওকালত সুদ্ধ নয়। সদকা দানকারী যদি বিশ্বস্ত কাউকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দরিদ্রের উকিল নিয়োগ করেন তাহলেই ওকালাত সুদ্ধ হবে। অন্যথায় এই ওকালত সুদ্ধ হবে না এবং জাকাতও আদায় হবে না।

কোন কোন কাজে অন্যদের দায়িত্ব দেয়া

প্রমাণ :—

وَكَلني رسول الله صلي الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان؛ فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم...

আবু হুরায়রা (রা:)-এর হাদিস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের জাকাত সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। তখন আমার নিকট এক আগন্তুক এসে মুঠো ভরে খাবার নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম : আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব...।[1] এই ভাবে তিনি তার দায়িত্ব-ভার কিছুটা লাঘব করতেন।

ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ সব কাজ নিজে নিজে আদায় করতে পারেন না। তাই অনিবার্য কারণবশতই দায়িত্বশীলকে অন্যকে তার প্রতিনিধী দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হয়। এইভাবে তিনি অনেক কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। তবে এই লক্ষ্য তখনই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব যখন যাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারা প্রধান দায়িত্বশীলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন এবং তিনি তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের জায়গাগুলো সম্পর্কে সম্মক অবগত থাকেন। যাতে তিনি

[1] বোখারি : ৫০১০।

সবাইকে তাদের উপযোগী কাজগুলোর দায়িত্ব দিতে পারেন। এবং তারাও দায়িত্বটি সঠিকভাবে আদায় করতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এভাবেই কাজ করেছেন। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। এই অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এক সময় তারা হয়ে উঠেছিলেন আলোকিত দীপ, উম্মাহর পথপ্রদর্শক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে নতুন জীবন দান করেছেন এবং মানব ইতিহাসের আকাশকে আলোকিত করেছেন।

আজকাল দেখা যায় অনেক সালেহ, মহান ব্যক্তিগণ, সৎ কাজের প্রতি অতি আগ্রহের কারণে, নিজেই সব দায়িত্ব পালন করতে চান। ফলত কোনটাই তারা পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন না। কিংবা এক সাথে অনেক কাজে হাত দেন, অথচ তার জন্য উপযোগী ছিল এর মাঝে প্রধান কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। আবার অনেকে এমন ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেন যারা এই সব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম না। নি:সন্দেহে এ এক দু:খজনক বাস্তবতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার সাহাবিদের হাতে বিভিন্ন দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন, আজ আমাদের উলামারাও তার প্রয়োজন বোধ করছেন। এই সংকট অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক তীব্র। বিশেষত রমজানে এই সংকট তীব্র হয়ে উঠে। কারণ এই সময় তারা অনেক মহান কাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য তাঁদের উচিত দায়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা এবং যোগ্য দায়ি গড়ে তোলা, যাদের হাতে বিভিন্ন দায়িত্ব ছেড়ে তারা তাদেরকে উপযুক্ত করে তুলবেন এবং তাদের মূল্যবান সময়কে তুচ্ছ কাজে জড়ানো থেকে হেফাজত করতে পারবেন। ফলত তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে পারবেন।

দ্বীনের জ্ঞান চর্চা এবং দ্বীনের ময়দানে দাওয়ার ক্ষেত্রে যা আমাদের জন্য কল্যাণকর, উপযোগী, যাতে ইসলাম ও মুসলমানদের

সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে, রহমান আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা আল্লাহ যেন তা করার তওফিক দান করেন।

রমজানের পরও এবাদত অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান

এবাদত এবং আল্লাহ আনুগত্যে অব্যাহত থাকতে পারা এবাদত পালনে বান্দা সফল, যথার্থ তওফিকপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ তার আমল কবুল করেছেন—তার অন্যতম প্রমাণ। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে, রমজান অতিবাহিত হওয়ার পরও রমজান মাসের সে এবাদত—সিয়াম, তা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। রাসূল বলেন :—

من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.

'যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে অত:পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে সে যেন গোটা বছর রোজা রাখে'।[1]

বস্তুত আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল হচ্ছে যা—স্বল্প হলেও—স্থায়ী। আর পুণ্য ও পাপ দুটিই তার সমগোত্রীয়কে ডেকে আনে। এই কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাবতীয় আমল ছিল স্থির স্থায়ী।[2] তিনি যখন কোন আমল শুরু করতেন তখন তা স্থায়ীভাবে পালন করতেন।[3]

যে ব্যক্তি রাসূলের আদর্শের প্রত্যয়ী, অনুসারী সে স্বাভাবিকভাবেই এই পবিত্র মাসের পর এবাদত, আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখবে। কারণ, সব মাসের রব তো অভিন্নই এবং সময় দ্রুত ধাবমান, জীবন প্রতি মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে আসছে, আর আল্লাহর পণ্য

---

[1] ইবনে মাজা : ২৪৩৩, হাদিসটি সহি।

[2] বোখারি : ৬১০১, আবু দাউদ : ১৩৭০।

[3] মুসলিম : ৭৪৬।

অনেক মূল্যবান, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও আনুগত্যের পরম ও চরম সাধনা না করলে মানুষ এই মূল্যবান বস্তু অর্জন করতে পারবে না। অব্যাহত এবাদত ও সাধনাই একমাত্র বান্দাকে তা অর্জনের তওফিক ও রহমত দান করতে পারে।

অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমজানে বান্দা অধিক এবাদত করবে—সন্দেহ নেই এটাই সুন্নতি পদ্ধতি। যেমন ইবনে আব্বাস (রা:)-এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন:—

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড় দানবীর আর রমজানে তিনি (অন্য সময়ের তুলনায়) বেশি দানবীর হয়ে উঠতেন'।[1] এবং আয়েশা (রা:) এর হাদিস :—

كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

'রমজানের শেষ দশ দিনে রাসূল অন্য সময়ের তুলনায় বেশি এবাদত করতেন'।[2]

তবে এর অর্থ এই নয় যে, রমজান হচ্ছে এবাদতের মৌসুম, ফলে রমজানেই এবাদত করবে অন্য সময়ে বেশি এবাদত করতে হবে না। এই হাদিস এবং এই ধরনের অন্যান্য নসগুলো—যা রমজানের ও অন্যান্য মাসের এবাদতের তুলনামূলক পার্থক্য প্রমাণ করে—স্বয়ং এই নসগুলো থেকেই প্রমাণ করা সম্ভব যে, এবাদত কোন মৌসুমি বিষয় নয় যে নির্দিষ্ট মৌসুমে তা করা হবে অন্য সময় বেশি না করলেও

---

[1] বোখারি : ৬, মুসলিম : ২৩০৮।

[2] মুসলিম : ১১৭৫, তিরমিজি : ৭৯৬।

হবে। তার প্রমাণ হাদিসে উল্লেখিত أجود (অধিক দানশীল হয়ে উঠতেন) শব্দটি। মানে রমজানে রাসূল অন্য সময়ের তুলনায় বেশি দান করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অন্য সময়েই এই কাজ, দান করতেন না ; তবে এই নির্দিষ্ট সময়ে তা হত তুলনামূলক বেশি।

অনুরূপ 'يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيرها (শেষ দশ দিনে তিনি তুলনামূলক বেশি এবাদত করতেন) এ থেকেই কিন্তু প্রমাণিত হয় যে, অন্য সময়েও এই এবাদত করতেন। তবে এই সময়ে তুলনামূলক বেশি করতেন। বস্তুত রমজান হচ্ছে তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহের কাল। এই সময়েই যে যথার্থ পরিমাণে পাথেয় সংগ্রহ করবে, তার উপর নির্ভর করেই সে নিরাপদে ও উদ্দীপনার সাথে পরবর্তীতে স্টেশন অর্থাৎ পরবর্তী পাথেয় অর্জনের কাল দ্বিতীয় রমজানে পৌঁছে যাবে।

তবে স্বাভাবিকভাবেই, এবাদতের বৃত্তিগুলোকে শক্তিশালী করার আগ পর্যন্ত বান্দা এই শক্তি অর্জন করতে পারবে না। এবাদতের বৃত্তিগুলোকে প্রখর ও শক্তিশালী করার উপায় হচ্ছে, স্রষ্টার পরাক্রম, সম্পূর্ণাঙ্গতা, প্রতিদান ইত্যাদি সিফাতগুলো ভেবে তাঁর বড়ত্ব, দুনিয়ার তুচ্ছতা ও আখেরাতে গুরুত্ব এই সব ভাবনা মনে দৃঢ় করা এবং জান্নাতের নেয়ামত—যা আল্লাহ মোমেনদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা দেখেনি কোন চোখ, শোনেনি কোন কান এবং কোন মানুষের কল্পনাতেও যা কখনো উদিত হয়নি—এবং যে তাঁর জিকির থেকে উদাসীন থাকে তার উচিত তিনি যে ভয়ংকর জীবন এবং তপ্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার বিশ্বাস মনে বদ্ধ মূল করবে। এই ভাবে বান্দার মনে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তার ভয় বৃদ্ধি পাবে।

স্থায়ী লাগাতার এবাদতের শক্তি অর্জনের আরেকটি উপায় হচ্ছে এবাদতকে উপভোগ্য করে তোলা। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করা যে,

এবাদতই হচ্ছে তার প্রশান্তি ও আনন্দের প্রধান অনুষঙ্গ। কারণ মানুষ যখন কোন কিছুকে পছন্দ করে তখন তা তার জন্য উপভোগ্য বিষয় হিসেবে হাজির হয় এবং তা বেশি বেশি করা তার জন্য কষ্টকর হয় না। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এবাদত এমন উপভোগ্য ও শান্তিদায়ক ছিল। তাই তিনি বেলাল (রা:)-কে বলেছিলেন :—

يا بلال: أقم الصلاة، أرحنا بها.

'বেলাল ! নামাজের ব্যবস্থা কর এবং তার মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও'।[1]

তিনি আরো বলেছেন :—

وجعلت قرة عيني في الصلاة.

'আমার নয়নের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজে'।[2] অনুরূপ এক রাতে তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন—

يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرَّك، قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي.

'আয়েশা, ছাড় ! আমি আমার রবের এবাদত করব। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ কছম আমি আপনার সান্নিধ্য পছন্দ করে এবং যা আপনাকে আনন্দ দেয় তাও পছন্দ করি। তিনি বলেন, তখন তিনি উঠে গিয়ে উজু করে নামাজ পড়তে লাগলেন।'[3] এরপর বিস্মিত আয়েশা রাসূলের নামাজ, তার খুশু, কান্নার বিবরণ দিয়েছেন।

---

[1] আবু দাউদ : ৪৯৮৫, হাদিসটি সহি।

[2] নাসায়ি : ৩৯৩৯।

[3] ইবনে হিব্বান : ৬২০।

যে এবাদত উপভোগ করে আর যে নিছক দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য হয়ে, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় করে তাদের উভয়ের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

'এবাদতের মৌসুম'-গুলো ছাড়া অন্য সময়ে, আলসেমি ও উদাসীনতার ফলে, আমরা যে সময় অপচয় করি সম্ভাবনার অপব্যবহার করি, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক-জাতীয় শুমারি নিলে দেখা যাবে এতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কি ভয়ানক-প্রকাণ্ড।

বস্তুত আমরা অনেক সময়েই অলস কর্মহীন সময় কাটাচ্ছি। অথচ কেয়ামতের দিন প্রতিটি বান্দাই কামনা করবে : তার সঞ্চয়ে যদি আরো কিছু পুণ্য থাকত !! যা দিয়ে কোন পাপ মোচন করতে পারে বা স্তর উন্নতি ঘটাতে পারে।

'এবাদতের মৌসুম' ছাড়া অন্যান্য মৌসুমে এবাদত, দাওয়াত, ও অন্যান্য দ্বীনী তৎপরতায় উদাসীনতা ও আলসেমির ফলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে আমারা যে কি ভীষণ অপরাধ করছি, এর ফলে আমরা কি পরিমাণ সময় ও অপার সম্ভাবনা নষ্ট করছি এবং উম্মাহর কল্যাণে, দাওয়াতি এলাকায় বা অন্য ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগ হলে তার কি ইতিবাচক ফল ফলত—তার হিসেব আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রমজানে সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে, তা আমাদেরকে এই আত্মবিশ্বাস দান করে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে পারলে, তাঁর সহযোগিতা পেলে এবং যথার্থ চেষ্টা করলে আমরা অনেক অনেক কাজ করতে পারি।

রমজানে আমাদের তৎপরতাই হতে পারে অন্যান্য সময়ের জন্য আমাদের সবচেয়ে কার্যকর আদর্শ। রমজানে আমরা এই এই... কাজগুলো করেছি, অর্থ হচ্ছে আমরা ইচ্ছে ও চেষ্টা করলে অন্য সময়ে তা করতে পারি। তা আমাদের সক্ষমতার মধ্যেই আছে। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অন্য সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতার দোহাই দেওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত বা সামাজিক এই সব প্রতিবন্ধকতা

রমজানে যদি আমরা অতিক্রম করতে পারি, তাহলে, সেই উদ্দীপনা টিকিয়ে রাখলে অন্য সময়ে আমরা তা অতিক্রম করতে পারব। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু সর্বদা আমাদের দেখছেন। জান্নাত জাহান্নামও প্রস্তুত এবং সেই সাথে প্রস্তুত হচ্ছে তার নাগরিকরা।

সুতরাং রমজান ও তার বরকত এবং জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত ও জাহান্নামে দ্বার বন্ধ এবং শয়তান মুক্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমাদেরকে সেই ম্যাপ ও প্ল্যান তৈরি করে নিতে হবে, পরবর্তী পাথেয় অর্জনের স্টেশনে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত কল্যাণের প্রতি যাত্রায় যার উপর দিয়ে আমরা হেঁটে যাব—সম্পূর্ণ উদ্যমের সাথে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে। কারণ তিনি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। আমরা তার মুখাপেক্ষী বান্দা।

শাওয়ালের রোজা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেছেন من صام رمضان যে রমজানের রোজা রাখল... এই থেকে বুঝা যায়, কারো যদি রমজানের কোন রোজা কাজা হয়ে যায় তাহলে সেই কাজা আদায় করেই সে শাওয়ালের রোজা রাখা শুরু করবে। কারণ, যার উপর কাজা আছে তার ক্ষেত্রে বলা যায় না যে, সে রমজানের রোজা রেখেছে। কাজা আদায়ের পর সে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখবে—লাগতার বা বিরতি দিয়ে, মাসের যে কোন দিনে। তবে শুরুতে, তাড়া-তাড়ি রাখাই উত্তম। সপ্তাহের যে কোন দিনে এই রোজা রাখতে পারে। তবে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং আইয়ামে বিজ-এ (মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এই রোজা অন্য সময়ে রাখার তুলনায় উত্তম। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে রাখুন। আমাদেরকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করুন। আমাদেরকে আপনার রহমত দান করুন, আমাদেরকে বেশ বেশি অনুগ্রহ করুন—হে সবচেয়ে বড় দয়ালু, হে মহান দাতা।

উপসংহার

এতক্ষণ, পিছনের পৃষ্ঠাগুলোতে, আমরা ইতিহাসের এক বরকতময় অধ্যায় পাঠ করেছি, সৌরভময় যে অধ্যায়ে আছে আমাদের হাবিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত। আমরা কিছু সময় তার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করেছি। জানতে পেরেছি এই পবিত্র মাসের আগমন ঘনিয়ে এলে তিনি কেমন আনন্দিত হয়ে উঠতেন, উদ্বেল হতেন অপার মহিমায়, যথার্থভাবে তা যাপনের প্রস্তুতি নিতেন এবং এই মাসে তিনি কি গভীর একনিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের সাথে তার রবের এবাদত করতেন।

সাথে সাথে আদায় করে যেতেন তার স্ত্রীদের যাবতীয় হক—তাদের সামাজিক-পারিবারিক চাহিদা পূর্ণ করতেন, তাদের শিক্ষা দিতেন, নির্দেশনা দান করতেন।

সব কিছুর পর, এত সব কিছুর সাথে সাথে তিনি, গোটা একটি জাতির সংস্কার—মুর্খদের শিক্ষা, জ্ঞানীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান, তা পরিচালনা—তার যে মহান ও কঠিন দায়িত্ব ছিল—পালন করতেন সম্পূর্ণভাবে। এক কাজ অন্য কাজ থেকে তাকে সরিয়ে দিতে পারত না। এক দিকে নজর দিতে গিয়ে তিনি অন্য দিকের প্রতি কোন ধরনের উদাসিনতা প্রদর্শন করেননি।

মূলত তিনি হচ্ছেন মানবীয় পূর্ণতার এক পরম পরাকাষ্ঠা, আলো ছড়িয়ে মানবীয় আদর্শের সর্বোচ্চ আদর্শ নির্মাণ করেছেন তিনি। তিনি উম্মতের জ্ঞানী, দায়ি ও সর্ব সাধারণ—সবার জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ ও প্রমাণ।

সুতরাং আমাদের যাবতীয় সফলতার অনিবার্য শর্ত হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের নির্মল-শীতল ছায়ায় জীবন যাপন করা—তিনি কেমন জীবন যাপন করতেন, কীভাবে তিনি তাঁর জীবনের পথে আদর্শ নির্মাণ করেছেন তা জানা এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালনা কারা। কারণ, এই পথই হচ্ছে সর্বাধিক সরল ও

সঠিক পথ এবং একমাত্র এই পথেই চলার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জন করা যাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :—

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم.

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

আমি বিশ্বাস করি, যদি আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে দ্বীন যাপনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ্য ফলাফল দেখতে পাব। এবং বুঝতে পারব এই মাস যাপনের ক্ষেত্রে উম্মতের অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তবতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মাঝে ব্যবধান কত সুদূর। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, তার অন্যতম :—

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে রমজান যাপন করেছেন এবং তার সৌরভময় সিরাত এই ক্ষেত্রে কেমন ছিল তার সম্পর্কে অজ্ঞতা।

২. রোজার হেকমত এবং এই মাসে নির্ধারিত বিশেষ এবাদতগুলোর লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীনতা।

৩. অনেক মানুষের এই ধারণা যে, রোজা হচ্ছে কিছু বর্জনমুখী কর্ম। তারা রোজার সে সব করণমুখী বিষয়গুলো বেমালুম ভুলে যান, যা ছাড়া রোজার লক্ষ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়।

৪. বিভিন্ন পাপ ও গোনাহ যে রোজাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে উদাসিনতা। এই ধরনের গোনাহ রোজা ভঙ্গ না করলেও তার প্রতিদানকে কমিয়ে দেয়। এমনকি, যদি তা বড় আকার ধারণ করে তাহলে রোজাদারের ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট বরণ করা সত্ত্বেও সে রোজা দ্বারা কোন ধরনের সওয়াব অর্জন করতে পারে না।

৫. এমন বিষয়ে লিপ্ত থাকা, যা—জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও—রোজার লক্ষ্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, অতিরিক্ত ও সুস্বাদু খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকা, অযথা রাত জেগে দিনে ঘুমানো, অর্থহীনভাবে সময় অপচয় করা, নানা সামাজিক সম্পর্ক গড়া ও রক্ষা করা, আখেরাতের প্রতি শিথিলতা করা এবং দুনিয়া ও স্বার্থ উদ্ধারে অতিরিক্ত লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই সংকটগুলো এবং এই ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিগুলো কাটিয়ে উঠা ও অনিষ্টকর পরিণতি থেকে মুক্তির জন্য যা করতে হবে তার অন্যতম :—

প্রথমত : উম্মাহকে সঠিক পরিগঠন এবং তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে আলেম ও দায়িদের যে দায়িত্ব, তারা যথার্থভাবে তা পালন করবেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। উদাহরণত, তাদেরকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে জনসাধারণের সাথে মিশতে পারেন। কিংবা, তারা তাদের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সম্ভব এবং শরীয়তে বিধানাবলী পালন উপযোগী জীবন্ত কিছু জীবনাদর্শ উপস্থিত করতে পারেন। কিংবা এই কাজ তারা করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম বা নানা ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়ত : যারা আসলেই নিষ্ঠার সাথে জীবনের সাফল্য চান, ব্যক্তিগতভাবে তারা প্রত্যেকে এই জীবনে তার যে দায়িত্ব ও পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করে যাবে। এইভাবে তার মাঝে কর্মনিষ্ঠা তৈরি হবে এবং উদাসীনতা কেটে যাবে। এবং তার পক্ষে যে-যে ধর্মীয় কাজ ও এবাদত আদায় করা সম্ভব তার তুলনামূলক বিচার করে তার শ্রেষ্ঠগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে। যাতে সে, তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে না জড়িয়ে মূল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও এবাদত চর্চা করতে পারে এবং তার সময়ের সর্বাধিক ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এবং সবাই নিজেকে, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ

পড়া, ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে এবাদতে মগ্ন থাকা... এই জাতীয় এবাদতে নিজকে অভ্যস্ত করে তুলবে, যাতে পরেও এইগুলোর চর্চা অব্যাহত রাখতে পারে।

তৃতীয়ত : জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়, বিশেষত: রমজানে এবং রোজা পালনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণকে সপ্রাণ ও সতেজ করে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন রমজানের সঠিক শিক্ষা, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঠিক জ্ঞান চর্চা ও তার প্রচার এবং সমাজের সেই বস্তুগত শর্ত তৈরি করা, যার ফলে আত্মিক পবিত্রতা অর্জন, কল্যাণের চর্চা ও প্রচার এবং অকল্যাণ থেকে বিরত থাকা এবং তার বিরোধিতা করা সহজ হয়।

চতুর্থত : মিডিয়া, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দাওয়াত... ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সব দ্বীনী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দ্বীনসম্মত এবং আধুনিক জীবন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম, তাদের সামনে এমন নির্দেশনা হাজির করতে হবে, যাতে উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, এমনকি, যুবক এবং বিশেষত: যুবতীরাও সঠিকভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালন করতে পারে।

পঞ্চমত : ব্যক্তিগতভাবে দায়িরা এবং দায়ি সংগঠনগুলো এই ক্ষেত্রে তার কর্মপদ্ধতি ও তৎপরতার পুনর্বিবেচনা করবেন, যাতে তারা, পরিমাণ ও মান উভয় ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে পারেন এবং এই সংকট মোকাবিলায় আরো কার্যকরী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন। যাতে আমাদের তাকওয়া বাস্তব রূপ লাভ করে এবং আমাদের ইমান আরো মজবুত হয়ে উঠে।

আল্লাহ আমাদের তওফিক দান করুন।

সমাপ্ত